বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

নভেম্বর ◆ ২০২১

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)'র

আত্‌তানভীর

[তাফসীরুল কুরআন]

নিয়মিত

- জীবন জিজ্ঞাসা ◆
- একনজরে গত মাস ◆
- জানার আছে অনেক কিছু ◆
- বিজ্ঞান ◆
- এই মাসে এই চাঁদে ◆
- আবাবীল ফৌজ ◆
- কবিতা ◆
- চিঠিপত্র ◆

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
২৮তম বর্ষ ■ ১১তম সংখ্যা
নভেম্বর ২০২১ ♦ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৮ ♦ রবি. আউ.-রবি. সানী ১৪৪৩

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
আখতার হোসাইন জাহেদ

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মোখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

সহ-সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি
মিফতাহুল ইসলাম তালহা

সার্কুলেশন ম্যানেজার
এস এম মনোয়ার হোসেন

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ২৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/ আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
কল্যাণকামিতাই ধর্ম/ মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৬

সাহাবা
আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)/ মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী ০৮

প্রবন্ধ
সুবিচার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ/ মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার ১১
গৃহে প্রবেশের কুরআনী বিধান/ খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী ১৩
মহাকবি আল্লামা ইকবাল: খুদী ও ইসলামী ঐক্য/ আবদুল মুকীত চৌধুরী ১৪
নামাযে মনোযোগী হওয়ার গুরুত্ব ও করণীয়/ মাওলানা আ.ন.ম কুতুবুজ্জামান ১৮

তাসাওউফ
আল্লাহর সাথে আউলিয়ায়ে কিরামের সম্পর্কের স্বরূপ/ মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ২০

শ্বাশ্বত বানী
ফুতুহুল গাইব / মূল: গাউসুল আযম আব্দুল কাদির জিলানী (র.)
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের ২২

স্মরণ
মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) সারহিন্দের উজ্জ্বল প্রদীপ/ মারজান আহমদ চৌধুরী ২৩

ফিকহ
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ফিকহী মতপার্থক্য/ মো. মুহিবুর রহমান ২৫

সফরনামা
ভারত সফরে কয়েকদিন/ রুহুল আমীন খান ২৭

মসনবীর গল্প
কান্নায় হবে তোমার সিদ্ধিলাভ/ ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩০

আন্তর্জাতিক
মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে তুরস্ক/ রহমান মুখলেস ৩৭

খাতুন
পাশ্চাত্যের নারী চরিত্র: নগ্ন বেহায়াপনার আলেখ্য/ অধ্যাপিকা হাফিজা খাতুন ৪০
এক ডিভোর্সি বোনের খোলা চিটি ৪২

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৪৩
জীবন জিজ্ঞাসা ৪৫
এক নজরে গত মাস ৪৯
জানার আছে অনেক কিছু ৫৩
বিজ্ঞান ৫৩
কবিতা ৫৪
আবাবীল ফৌজ ৫৫
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, মন্দিরে হামলা খুবই অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। সরকার অপরাধীদের সনাক্তকরণ ও শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে তৎপর রয়েছে। কিন্তু তার সূত্র ধরে উসকানিমূলক স্লোগান ভারতীয় রাজনীতিরই কোনো অংশ নয়তো? বিষয়টি শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশি সনাতন ধর্মীয় জনগণের চিন্তায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

نحمده ونصلي على رسوله الكريم– اما بعد

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়েছে। গত ২০ অক্টোবর রাজ্যজুড়ে চলা এ হামলায় অন্তত ছয়টি মসজিদ এবং এক ডজনেরও বেশি বাড়িঘর-দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়েছে। জর্ডানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মাকতুব মিডিয়ার বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যভিত্তিক দৈনিক দ্য সিয়াসাত ডেইলি।

ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বজরং দল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ব্যানারধারী কিছু সদস্য এই হামলার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যমটি।

সম্প্রতি বাংলাদেশে কুরআন অবমাননার জেরে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর কয়েকটি জায়গায় হামলা হয়েছে। তার জের ধরেই ত্রিপুরায় হামলা চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো বলে জার্মানভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ডয়েচে ভেলে জানিয়েছে।

ভারতে মুসলিম নির্যাতন নতুন কোনো বিষয় নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে এ নির্যাতনের মাত্রার কিছুটা কম-বেশ হলেও একদিনের জন্যও পুরো ভারত বর্ষে মুসলমানরা নিরাপদে ছিলো না। এ সময়ে ভারত শাসিত কাশ্মিরকে কখনও নরককুন্ড আবার কখনোবা বৃহৎ কারাগারের সাথেই তুলনা দিয়ে আসা হয়েছে। ভারতে মুসলিম নির্যাতনের মাত্রা ব্যাপকতা লাভ করে ২০১৪ সালে যখন গুজরাট দাঙ্গার সময়ের বিতর্কিত মূখ্যমন্ত্রী ও দাঙ্গার মূল কুশিলব হিসেবে অভিযুক্ত নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিতর্কিত সংগঠন আরএসএসের রাজনৈতিক শাখা ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। বিজেপি সরকার কাশ্মিরের জনগণের সাথে প্রতারণা করে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫-এ ও ৩৭০ ধারা বাতিল করে, যা কাশ্মিরের জনগণকে চরম ক্ষিপ্ত করে তুলে। সেই থেকে কাশ্মিরে কার্ফিউ, ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ১৪৪ ধারা জারি, বিদেশি মিডিয়ার অবাধ বিচরণ নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন অমানবিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যাতে প্রকারান্তরে বাহিরের পৃথিবী থেকে কাশ্মিরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার শামিল। বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের জেরে গতবছর ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ক্ষমতাসীন সরকারের মদদে অনুষ্ঠিত দাঙ্গায় বহু মুসলিম বসতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, অনেকে আহত-নিহত হন। এমনকি কমপক্ষে ৪ টি মসজিদে আগুন দেওয়া হয়। আর এ সকল অপরাধ সংগঠিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টির হিন্দু জাতিয়তাবাদী স্লোগান 'জয় শ্রীরাম' বলে, যা স্বয়ং ভারতের অন্যান্য উদার রাজনৈতিক দলের কাছেও বিতর্কিত ও আপত্তিকর। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের ট্রেনে, বাসে কিংবা রাস্তা-ঘাটে মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা, অন্যথায় পিটিয়ে মেরে ফেলা, চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া এবং বয়োবৃদ্ধদের দাড়ি ধরে অপমান করার ঘটনা সচরাচর মিডিয়ায় আসছে।

এই যখন অবস্থা তখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে এই স্লোগান দেওয়া কি উসকানি নয়? বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, মন্দিরে হামলা খুবই অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। সরকার অপরাধীদের সনাক্তকরণ ও শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে তৎপর রয়েছে। কিন্তু তার সূত্র ধরে উসকানিমূলক স্লোগান ভারতীয় রাজনীতিরই কোনো অংশ নয়তো? বিষয়টি শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশি সনাতন ধর্মীয় জনগণের চিন্তায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

একটি রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণকে শান্তি শৃংখলা রক্ষায় মূখ্য ভূমিকা রাখতে হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষ সচেতন থাকলেও মাঝে মধ্যে অদৃশ্য কোনো শক্তির কারণে তা বাধাগ্রস্ত হয়, যা কখনোই কাম্য নয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ মুসলমান। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, সবাই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কাউকে তার ধর্ম পালনে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না, তার উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে না। অন্য ধর্মের উপাস্যকে গালি দেওয়া যাবে না। সামাজিক জীবনে ও যাবতীয় বিচারকার্যে সকল ধর্মের লোক সমান অধিকার ভোগ করবে। কোনো নিরপরাধ ব্যাক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- (বলুন, হে অবিশ্বাসীরা) তোমাদের দ্বীন তোমাদের (থাক) এবং আমার দ্বীন আমার। (সূরা কাফিরূন, আয়াত-৬), ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই। (সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৬), আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা (মূর্তিপূজকরা) ডাকে, তাদের তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে। (সূরা আনআম, আয়াত-১০৮), হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদান করো। আর কোনো গোত্রের ওপর ক্ষোভ যেন তোমাদের বেইনসাফি করতে উদ্যত না করে। ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করো। কারণ, ন্যায়পরায়ণতা তাকওয়ার নিকটবর্তী। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৮), দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত-৮)

ভারতবর্ষে শত শত বৎসর মুসলিম শাসনে মুসলিম ও অমুসলিমরা পরস্পর সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সঙ্গে বসবাস করে আসছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ উপনিবেশের ফলে এবং তাদের বিভাজন নীতির শিকার হয়ে এদেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে, সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে বসবাস করা সম্ভব নয়। আর একসঙ্গে বসবাস করতে হলে কিছুটা বৈচিত্র্য থাকবেই। আর এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য গড়তে হবে। তাই আসুন, আমরা সকল ধর্মের লোক পরস্পরের অধিকার ক্ষুন্ন না করে মিলেমিশে বসবাস করি এবং সুন্দর বাংলাদেশ গড়ি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

আত্-তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً– قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ-

অনুবাদঃ আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। তারা বললেন, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? (সূরা বাকারা, আয়াত-৩০)

তাফসীরঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

আর যখন আপনার রব ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি যমীনে আমার এক প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।

কুরআন শরীফে ব্যবহৃত جاعل শব্দের উদ্দেশ্য হলো- خالق আর خليفة শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। (তাবারী, ১/৪৭৫) যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন, ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

-অতঃপর আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি তোমরা কিরূপ কাজ করো তা দেখার জন্য। (সূরা ইউনুস, আয়াত-১৪)

হযরত ইবন ইসহাক (র.) বলেন, خليفة শব্দের অর্থ অবস্থানকারী ও বসবাসযোগ্য করে তৈরিকারী।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জিন জাতিই বসবাস শুরু করে। তারা এ যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করল এবং রক্তপাত করল। পরস্পরকে হত্যা করল। তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি ইবলীসের নেতৃত্বে ফিরিশতাদের এক সৈন্যবাহিনীসহ ইবলীসকে পাঠালেন। ইবলীস তাদেরকে মেরে ফেলল। জিন জাতির যারা বাকী ছিল, তাদের সাথে সমুদ্রের দ্বীপে এবং পর্বত প্রান্তরে ইবলীসের সাক্ষাৎ হয়। এরপর হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হলো। আদম যমীনে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। (তাবারী, ১/৪৭৮) এ মর্মানুযায়ী খলীফা বলতে জিন বুঝানো হয়েছে, যারা পৃথিবীতে বসবাস করত এবং তা আবাদ করত। কেউ কেউ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً এর অর্থ এভাবে করেন, خلف হচ্ছে একজন অপরজনের প্রতিনিধিত্ব করা, আর তাঁরা হলো হযরত আদম (আ.) এর সন্তানরা। যারা নিজেদের পিতা আদম (আ.) এর প্রতিনিধিত্ব করেন। এভাবে যুগে যুগে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধিত্ব করবে। (তাবারী, ১/৪৭৮) ইহা হযরত হাসান বসরী (র.) এর অভিমত।

হযরত ইবন যায়িদ (র.) বলেন, আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে অবহিত করেন যে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা যমীনে তার প্রতিনিধি সৃষ্টি করবেন, যারা আল্লাহ তাআলার বিধি নিষেধ পৃথিবীর বুকে বাস্তবায়ন করবে। যেমন বাদশাহর প্রতিনিধি বাদশাহর নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করে।

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

ফিরিশতারা আপত্তি করে বলেন, হে আল্লাহ! আপনি কী এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করবেন, যারা যমীনে ফাসাদ করবে এবং রক্তপাত করবে? (তাবারী, ১/৪৭৯)

হযরত আদম (আ.) থেকে ঝগড়া-ঝাটি এবং রক্তপাত প্রকাশ হয়নি। ফিরিশতারা যেই ঝগড়া এবং রক্তপাতের কথা বলেন, তা ধারণা করেই বলছিলেন। কারণ ফিরিশতারা গাইবি খবর জানেনা।

ফাসাদ আর রক্তপাত সম্পর্কে হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এর হাদীস হতে জানা যায়- ইবলীস ফিরিশতাদের অনেক গোত্রের মধ্য হতে একটি গোত্রের মধ্যে ছিল, যে গোত্রটিকে জিন বলা হত। তাদেরকে نار السموم হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, ইবলীসের নাম হারিস ছিল, সে বেহেশতের একজন পাহারাদার ছিল। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, ইবলীস সম্প্রদায় ছাড়া বাকি ফিরিশতাদেরকে নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন কারীমে যে জিন জাতির কথা উল্লেখ আছে ঐ জ্বীন مارج من النار অর্থাৎ لسان النار থেকে সৃষ্টি হয়েছে। لسان النار হচ্ছে ঐ আগুন যা জ্বলে উঠার সময় কেন্দ্রের চারিদিকে সৃষ্টি হয়; আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। জীন জাতিই হলো পৃথিবীতে প্রথম বসবাসকারী। তারা যমীনে ঝগড়া-বিবাদ করে, রক্তপাত করে এবং একে অপরকে হত্যা করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ফিরিশতার সৈন্যদলে ইবলীসকে প্রেরণ করেন।

মোটকথা পৃথিবীতে জিনদেরকে ইবলীস এবং তার সাথিরা মেরে সমুদ্রের দ্বীপে ও পর্বত প্রান্তরে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। যখন ইবলীস এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আনজাম দিতে সক্ষম হলো, তখন তার অন্তরে অহংকার আসল এবং বলল, আমি তো অনেক বড় একটি কাজ করলাম, যা অন্য কেউ করতে পারে নি। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের খবর সম্বন্ধে অবগত; কিন্তু ইবলীসের সাথি অন্যান্য ফিরিশতারা এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। তখন আল্লাহ তাআলা ইবলীসের সাথি ফিরিশতাদেরকে বলেন, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً অর্থাৎ আমি যমীনে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। এর উত্তরে ফিরিশতারা বলেন, আল্লাহ! আপনি কি যমীনে এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন যারা ঝগড়া করবে, রক্তপাত করবে, যেভাবে জিন জাতি করেছিল? জিনরা ঝগড়া করেছিল এবং রক্তপাত ঘটিয়েছিল। তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আমাদেরকে পাঠালেন, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যা জানি, তা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন, আমি ইবলীসের অন্তরের গর্ব ও অহংকার সম্পর্কে অবগত, যা সম্পর্কে তোমরা অবগত নও। (তাবারী, ১/৪৮২)

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো হযরত আদম (আ.) এর মাটি নেওয়ার জন্য, মাটি নেওয়া হলো। আল্লাহ তাআলা শক্ত আঠালো মাটি হতে হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করলেন। প্রথমে এ মাটিকে খামির বানানো হয়। এরপর এ মাটি হতে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেন। হযরত আদম (আ.) এর শরীর চল্লিশ রাত পর্যন্ত পড়ে থাকল।

ইবলীস আদম (আ.) এর কাছে আসা যাওয়া করত এবং তার দেহে পা দিয়ে মারত। এতে আওয়াজের সৃষ্টি হত অর্থাৎ মাটির ঝনঝনানি শুরু হত। যাকে আল্লাহ তাআলা এভাবে প্রকাশ করেন, مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ তারপর শয়তান আদমের মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়, আবার পিছনের রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে মুখ দিয়ে বের হয়। এরপর বলে, তুমি তো এমন কোনো বস্তু নও, যা থেকে এরূপ

আওয়াজ হতে পারে। আমি যদি তোমার উপর বিজয়ী হই তাহলে তোমাকে ধ্বংস করে দেব, আর তুমি আমার উপর বিজয়ী হলে আমি তোমার অবাধ্য হব। এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.) এর মধ্যে রূহ ফুঁকেন। এ রূহ হযরত আদম (আ.) এর মাথা দিয়ে প্রবেশ করে। এরপর তা শরীরের যে অংশ দিয়েই চলল, তা-ই রক্ত আর মাংসে পরিণত হয়ে গেল। যখন ফুঁক নাভী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন আদম (আ.) স্বীয় শরীরের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়েন। সাথে সাথে তিনি উঠে দাঁড়াতে চাইলেন কিন্তু পারেন নি। এর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا 'মানব ছিল ধৈর্যহীন ও অসহিষ্ণু সবকিছুতে তাড়াহুড়ো করে।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১১) দুঃখ কষ্টে বা আনন্দের সময় ও ধৈর্যধারণ করতে পারে না।

হযরত আদম (আ.) এর শরীরের ভিতর ফুঁক শেষ হয়ে গেলে, আদম (আ.) হাঁচি দিলেন। আল্লাহ তাআলার ইলহামের মাধ্যমে শিখিয়ে দেন الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলার জন্য। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম, তোমাকে আল্লাহ রহম করুন। এরপর আল্লাহ তাআলা ইবলীসের সাথে যারা ছিলেন সে সকল ফিরিশতাকে বললেন, (ঐ সকল ফিরিশতাদেরকে নয় যারা আসমানসমূহের মধ্যে ছিল) আদমকে সিজদা কর। ইবলীস ছাড়া সকল ফিরিশতা আদম (আ.) কে সিজদা করেন।

ইবলীস সিজদা করতে অসম্মতি প্রকাশ করল এবং মনে মনে অহংকারবোধ করল। সে বলল, আমি আদম (আ.) কে সিজদা করব না যেহেতু আমি আদম (আ.) থেকে উত্তম, বয়সে বড়, সৃষ্টিগতভাবে বেশি শক্তিশালী। যেহেতু আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে; আর আদম (আ.) কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে বলল, আগুন মাটি থেকে বেশি শক্তিশালী। যখন ইবলীস সিজদা করা হতে বিরত থাকল, আল্লাহ তাআলা তাকে সকল কল্যাণ থেকে নিরাশ করে দিলেন। তাকে শয়তানে মারদুদ করে দিলেন। তার নাফরমানীর জন্য তাকে এ শাস্তি প্রদান করা হলো। (তাবারী, ১/৪৮৪; ইবন কাসীর, ১/১০৮)

আল্লাহ তাআলা আদম (আ.) কে সবকিছুর নাম শিক্ষা দান করেন। তা ছিল ঐসব জিনিসের নাম যা দিয়ে মানুষ পরস্পর পরিচয় লাভ করে। চতুষ্পদ জন্তু, মাটি, সমতল ভূমি, সমুদ্র, পাহাড়, গাধা এবং এ জাতীয় অন্যান্য সৃষ্টির। তারপর এগুলোর নাম ঐ সকল ফিরিশতাদের সামনে পেশ করলেন যারা ইবলীসের সাথে ছিল যাদেরকে نَارِ السَّمُومِ উত্তপ্ত আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি সকল ফিরিশতাদেরকে বললেন, এসব জিনিসের নাম বল। যদি তোমাদের দাবিতে তোমরা সত্য হও। অর্থাৎ আমি কেন খলীফা সৃষ্টি করব তা যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে বলো।

যখন ফিরিশতাগণ জানলেন তারা অদৃশ্য বিষয় নিয়ে যেসকল কথাবার্তা বলেছিলেন তার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দোষারোপ করছেন যে, অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান তাদের নেই। উত্তরে তারা বলেন, سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ- আল্লাহ আপনি যা শিখিয়েছেন তাছাড়া আমরা অন্য কিছু জানিনা। তারা আরো বলেন, আপনি মহান ও পবিত্র। এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.) কে বলেন, হে আদম, তুমি এসব জিনিসের নাম বল। আদম (আ.) ফিরিশতাদেরকে এসব জিনিসের নাম সম্পর্কে অবহিত করেন। যখন আদম (আ.) ফিরিশতাদেরকে এ সব জিনিসের খবর দিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেন, হে ফিরিশতারা! আমি কি বলিনি একমাত্র আমিই অদৃশ্য বিষয় জানি, আর কেউ জানে না। আসমান এবং যমীনের মধ্যে প্রকাশ্যে এবং গোপনে যা কিছু হয় সবই জানি। অর্থাৎ ইবলীসের অন্তরে যে অহংকার ও গৌরবের সৃষ্টি হয়েছিল তা আমি জানতাম। (ইবন আব্বাস রা. হতে এ হাদীসটি বর্ণিত) [তাবারী, ১/৪৮৪-৪৮৫; তারীখে তাবারী, ১/৮৪; তাফসীরে ইবন কাসীর, ১/১০৮]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً এ কথা আল্লাহ তাআলা সকল ফিরিশতাদের বলেননি বরং নির্দিষ্ট একদল ফিরিশতাদের বলেছিলেন। যারা ইবলীসের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। যারা হযরত আদম (আ.) এর সৃষ্টির পূর্বে ইবলীসের সাথে এ যমীনে জীনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ কথা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বলেছেন, যেন তারা বুঝতে পারেন, তাদের ইলম পূর্ণ নয়। সাথে সাথে এ কথাও যেন বুঝতে পারেন, এ দুর্বল আদমের মধ্যে অনেক মহত্ব নিহিত রয়েছে। শুধু শারীরিকভাবে শক্তিশালী হলে মর্যাদা হাসিল করা যায় না। যেমনটি আল্লাহর দুশমন ইবলীস মনে করেছিল।

আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে এ অপছন্দনীয় কথা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাওবা করার জন্য তাওফীক দান করেন; তারা তাওবা করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করেন। তাদের সামনে ইবলীসের গোপন তথ্য প্রকাশ করেন। (তাবারী, ১/৪৮৬)

হযরত ইবন মাসউদ (রা.) একদল সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় জিনিস সৃষ্টি করে অবসর হলেন এবং আরশের প্রতি মনোযোগ দিলেন। তখন ইবলীসকে দুনিয়ার আসমানে নিয়োগ করেন। ইবলীস ঐ ফিরিশতাদের গোত্র হতে ছিল, যাদেরকে বলা হতো জিন। তাদেরকে জিন বলা হয় যেহেতু তারা জান্নাতের পাহারাদার ছিলেন। ইবলীসও পাহারাদার ছিল। অতঃপর ইবলীসের অন্তরে অহংকার চলে আসে। সে বলে আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দান করেছেন তা আমার বৈশিষ্ট্যের কারণেই দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা তার অহংকারের ব্যাপারে অবগত হন। তারপর আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে বলেন, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً এতে ফিরিশতারা বলেন, হে আল্লাহ! ঐ খলীফা দিয়ে কী হবে? যমীনে তার বংশ বৃদ্ধি পাবে, যমীনে তারা ফাসাদ করবে, পরস্পরে হিংসা করবে, একে অপরকে হত্যা করবে। আমরা আপনার প্রশংসা করছি এবং তাসবীহ পড়ছি ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি ইবলীস সম্পর্কে যা জানি, তোমরা তা জানোনা। (তাবারী, ১/৪৮৬)

অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল (আ.) কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যমীন হতে মাটি নেওয়ার জন্য। জিবরাইল (আ.) মাটি নেওয়ার জন্য আসলে পৃথিবী বলে উঠলো, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার থেকে পানাহ চাই যেন আপনি আমার মধ্যে অপূর্ণতা না আনেন। এর ফলে জিবরাঈল মাটি না নিয়েই ফিরে গেলেন। জিবরাঈল (আ.) আল্লাহকে বলেন, হে আল্লাহ! যমীন পানাহ চায় আপনার ওয়াসীলা ধরে তাই আমি পানাহ দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা অতঃপর হযরত মীকাঈল (আ.) কে প্রেরণ করেন। যমীন অনুরূপভাবে পানাহ চায় এবং পানাহ দেওয়া হয়। হযরত মীকাঈল (আ.) চলে আসলেন এবং যেভাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেছিলেন সেভাবে উত্তর দিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত আজরাঈল (আ.) কে প্রেরণ করেন। যমীন হযরত আজরাঈল (আ.) এর কাছে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে। হযরত আজরাঈল (আ.) বলেন, আমিও আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ পালন না করে যেন প্রত্যাবর্তন না করি। এভাবে আজরাঈল যমীনের উপরিভাগ হতে মাটি নিয়ে মিশিয়ে দিলেন। তিনি যমীনের এক জায়গা হতে মাটি নিলেন না বরং লাল, সাদা এবং কালো মাটি মিশ্রিত করে নিলেন। এজন্য বনী আদম ভিন্ন ভিন্ন রং এ জন্মগ্রহণ করে। তিনি মাটি নিয়ে আকাশে উঠলেন। এ মাটি ছিল কর্দমাক্ত নরম, যার একটি অপরটির সাথে লেগে যায়। আল্লাহ পাক এ মাটি স্বঅবস্থায় রেখে দিলেন। অবশেষে তা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে আসল রূপ পরিবর্তন হলো। একথার প্রতি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইঙ্গিত প্রদান করেন,

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ– فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.

-আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদায় অবনত হও। (সূরা সোয়াদ, আয়াত- ৭১-৭২)

আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতে আদমকে সৃষ্টি করলেন, যাতে শয়তান মানুষের উপর অহংকার করতে না পারে এবং আল্লাহ বলতে পারেন আমি নিজ হাতে যা তৈরি করলাম তার উপর তুমি অহংকার করছ কেন? এরপর আল্লাহ মানুষের দেহ তৈরি করলেন। তা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মাটির মধ্যে ছিল। ফিরিশতাগণ এর পাশ দিয়ে যেতেন এবং তাঁকে দেখে ভীত হতেন। সবচেয়ে বেশি ভীত হয়েছিল ইবলীস। সে আদম (আ.) এর দেহের পাশ দিয়ে যেত এবং তাতে আঘাত করত। ফলে দেহ থেকে আওয়াজ আসত। কলসীর শব্দের মতো ঝনঝন শব্দ হতো। এ বিষয়টিকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, (مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ) ইবলীস আদম (আ.) এর দেহের মুখ দিয়ে প্রবেশ করে পিছন দিয়ে বের হতো আর ফিরিশতাদেরকে বলতো ইহাকে ভয় পেয়ো না। তোমাদের রব হলেন অমুখাপেক্ষী আর এর অভ্যন্তর হলো শূন্য। আমি যদি তার উপর ক্ষমতাবান হই তাহলে অবশ্যই তাকে আমি ধ্বংস করে দিব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলেন আদমের দেহে রূহ ফুঁকে দিবেন তখন ফিরিশতাদের বললেন, আমি যখন তাতে রূহ দিব তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে। এরপর আদম (আ.) এর দেহে রূহ ফুৎকার করলেন। রূহ তার মাথায় প্রবেশ করলো, তিনি হাঁচি দিলেন। ফিরিশতা তাঁকে শিখিয়ে দেন আলহামদুলিল্লাহ বল, তিনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন। জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন, رحمك ربك আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। যখন রূহ চোখে প্রবেশ করল তিনি বেহেশতের ফলমূল দেখলেন। যখন রূহ আদমের পেটে প্রবেশ করল, খাওয়ার ইচ্ছে জাগল। এজন্য রূহ পায়ে পৌঁছার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বেহেশতের ফলের দিকে গেলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইনসান পয়দা করা হয়েছে তাড়াহুড়োর বৈশিষ্ট্য দিয়ে। অতঃপর ইবলীস ছাড়া সকল ফিরিশতা সিজদা করেন। ইবলীস সিজদা করা থেকে বিরত থাকে এবং গর্ব ও অহংকার করে। এভাবে সে কাফিরে পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন বস্তু তোমাকে আমার হুকুমে সিজদা করা থেকে বিরত রাখে? উত্তরে ইবলীস বলে, আমি আদমের চেয়ে উত্তম, আমি কেন সিজদা করব এমন এক মানুষকে যে হচ্ছে মাটির তৈরি? এতে আল্লাহ তাআলা রাগন্বিত হয়ে বলেন, এখান থেকে বের হয়ে যাও! তোমার অধিকার নেই অহংকার করার। তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও। তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী, ১/৪৮৫-৪৮৮; তারীখে ইবন আসাকীর, ৭/৩৭৭; তারীখে তাবারী, ১/৮১,৮৫)

অন্যান্য মুফাসসিরীনে কিরাম লেখেন, আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে আদম সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের মতামত প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন। এজন্য ফিরিশতারা পরামর্শমূলকভাবে প্রশ্ন করেন।

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ।খ

অর্থাৎ হে রব! কীভাবে তারা আপনার নাফরমানী করবে। অথচ আপনি তাদের সৃষ্টিকর্তা। এর উত্তরে তাদের পরওয়ারদিগার তাদেরকে বলেন, তাদের পক্ষ হতে এটিই ঘটবে, যদিও তোমরা তা জানোনা। তাফসীরকারগণ বলেন, أَتَجْعَلُ فِيهَا ।খ এ প্রশ্ন ফিরিশতাদের অস্বীকার করার আঙ্গিকে ছিল না বরং বাস্তবতা কী এবং প্রসঙ্গক্রমে তারা যে দিন রাত তাসবীহ পড়েন তাই বলা মকসুদ ছিল। অর্থাৎ অস্বীকার না করে এ কথাই বলা উদ্দেশ্য ছিল আমরা তো সর্বদা তাসবীহ পাঠে রত আছি। সুতরাং আহলে ফাসাদের একটি দল যমীনে সৃষ্টি করার কী উদ্দেশ্য? আল্লাহ তাআলা উত্তর দেন إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ আমি তাদের সৃষ্টির পর ফলাফল কী হবে না হবে তা জানি। তাদের মধ্য হতে আলিম, সালিহীন, আউলিয়া আর মুত্তাকী পয়দা হবে, যাদের দ্বারা যমীনে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। (তাবারী, ১/৪৯১)

বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

- ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
- মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনি তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে

E-mail: parwanabd@gmail.com

পরওয়ানা-এর

গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে

নিকটস্থ এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন

বার্ষিক চাঁদার হার

বাংলাদেশ	ঃ ৩০০ টাকা
ভারত	ঃ ১৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ	ঃ ২০০০ টাকা
যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ	ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	ঃ ৫০ মার্কিন ডলার

এজেন্সির নিয়মাবলি

- ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়
- ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না
- প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়
- সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো হবে
- আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে

যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন, ৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০

কল্যাণকামিতাই ধর্ম

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূল ভাষ্য

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ".(رواه مسلم)

অনুবাদঃ হযরত আবূ রুকাইয়া তামীম ইবন আউস আদদারী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, দ্বীন হলো কল্যাণকামিতারই নাম (অর্থাৎ কল্যাণকামিতাই ধর্ম)। আমরা বললাম, কার জন্য? নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য। (মুসলিম)

বর্ণনাকারী পরিচিতি

এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত তামীম আদ দারী (র.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁর উপনাম আবূ রুকাইয়া তথা রুকাইয়ার পিতা। রুকাইয়া তাঁর একমাত্র মেয়ে। এছাড়া তাঁর অন্য কোনো সন্তান নেই। তিনি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। আবূ নুআইম ইস্পাহানী বলেন, তিনি তাঁর সময়ের একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী ও ফিলিস্তীনের একজন আবিদ ছিলেন। ৯ম হিজরীতে তিনি ও তাঁর ভাই নাঈম মদীনা শরীফ আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন এবং এক রাকআতে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করতেন। (ইবন হাজার আল হাইতামী, আল ফাতহুল মুবীন, পৃষ্ঠা ২৫৩-২৫৪)

তারীখু বাগদাদ গ্রন্থে আছে, খারিজা ইবন মাসআব বলেন, চারজন ইমাম এক রাকআতে কুরআন শরীফ খতম করতেন: ১. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) ২. হযরত তামীম আদ দারী (রা.), ৩. হযরত সাঈদ ইবন জুবাইর (র.) ও ৪. ইমাম আবূ হানীফা (র.)। (খতীব আল বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৫৭)

হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদাতের পর তিনি শাম দেশে চলে যান এবং ফিলিস্তীনে বসবাস করতে থাকেন। ৪০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে ফিলিস্তীনের বাইতে জিবরীন বা বাইতে জিবরীল নামক স্থানে দাফন করা হয়। তাঁর থেকে আশিটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ইমাম মুসলিম (র.) এর সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, الدِّينُ النَّصِيحَةُ। নসীহত বা কল্যাণকামিতাই দ্বীন। এখানে দ্বীন বলতে ইসলাম উদ্দেশ্য। আর নসীহত এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন, কল্যাণ কামনা করা, সুপরামর্শ প্রদান করা, কারো জন্য নিষ্ঠার সাথে কোনো কিছু করা ইত্যাদি। এখানে নসীহত বা কল্যাণকামিতাকেই দ্বীন বলা হয়েছে। এর মানে এটি নয় যে, এটি দ্বীনের একমাত্র বিষয়। বরং এর মানে হলো, এটি দ্বীনের অন্যতম ভিত্তি বা একটি বড় বিষয়। এজন্য আল্লামা ইবন হাজার আল হাইতামী এ হাদীসের বাবের শিরোনাম দিয়েছেন 'আন নাসীহাতু ইমাদুদ্দীন' অর্থাৎ নসীহত বা কল্যাণকামিতা হলো দ্বীনের ভিত্তি।

নসীহত কার জন্য?

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উপরোক্ত বাণী প্রদান করলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন যে, কল্যাণ কামনা করা কার জন্য? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি কথা বলেছেন,

১. আল্লাহর জন্য,
২. আল্লাহর কিতাবের জন্য,
৩. আল্লাহর রাসূলের জন্য,
৪. মুসলিম জনসাধারণ ও তাঁদের নেতৃবৃন্দের জন্য।

আল্লাহর জন্য নসীহত বা নিষ্ঠা

আল্লাহর জন্য নসীহতের মূল অর্থ হলো, সকল ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইখলাস বা নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা। ইমাম নববী (র.) বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, আল্লাহর জন্য নসীহত বা নিষ্ঠার মানে হলো,

- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করা,
- তাঁর সিফাত বা গুণাবলির ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করা,
- সকল কামাল ও জালাল তথা পরিপূর্ণ ও

প্রতাপসমৃদ্ধ গুণাবলিতে তাঁকে ভূষিত করা,
- তাঁকে সবধরণের অপূর্ণতা থেকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করা,
- তাঁর আনুগত্য করা,
- তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা,
- তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা,
- তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করা,
- তাঁর অনুগত বান্দার প্রতি আন্তরিকতা রাখা,
- তাঁর অবাধ্য বান্দার প্রতি শত্রুতা পোষণ করা,
- তাঁর প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তির সাথে জিহাদ করা,
- তার নিআমতের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা,
- সকল বিষয়ে ইখলাস বা একনিষ্ঠতা অবলম্বন করা,
- উল্লিখিত বিষয়াবলি মেনে চলার দিকে অন্যকে আহবান ও উৎসাহ প্রদান করা।
- সকল মানুষের সাথে কোমল ব্যবহার করা, বিশেষত যারা এগুলো মেনে চলেন তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করা।

প্রকৃতপক্ষে এ সকল বিষয় বান্দার কল্যাণের উদ্দেশ্যেই আবর্তিত হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা কোন নাসীহ তথা নিষ্ঠাবান বান্দার নসীহত তথা নিষ্ঠার মুখাপেক্ষী নন। (ইমাম নববী (র.), শারহুল আরবাঈন, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭)

কিতাবুল্লাহ'র জন্য নসীহত বা নিষ্ঠা

কিতাবুল্লাহর প্রতি নসীহত বা নিষ্ঠার অর্থ হলো,

- এ বিশ্বাস রাখা যে, এটি আল্লাহর বাণী ও তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ,
- মানবীয় কথা-বার্তার এর সদৃশ নয়,
- সৃষ্টিজগতের কেউই কিতাব তৈরিতে সক্ষম নয়
- এ কিতাবকে সম্মান করা,
- এটি যথাযথভাবে তিলাওয়াত করা,
- সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করা,
- খুশু' তথা বিনয়ের সাথে তিলাওয়াত করা,
- তিলাওয়াতের সময়কালে হরফসমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ,
- বিকৃতিসাধনকারীদের বিকৃতি থেকে একে রক্ষা করা,
- এর প্রতি আঘাতকারীদের আঘাত প্রতিহত করা,
- এতে যা কিছু আছে তা সত্যায়ন করা,
- এর হুকুম মেনে চলা,
- এর জ্ঞান ও উপমাসমূহ অনুধাবন করা,
- এর উপদেশাবলি থেকে উপদেশ গ্রহণ করা,
- এর অলৌকিকতা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা,
- এর মুহকাম তথা সুস্পষ্ট আয়াত অনুযায়ী আমল করা,
- মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট আয়াতসমূহকেও স্বীকার করা,
- এর আম (ব্যাপক অর্থবোধক), খাস (নির্দিষ্ট অর্থবোধক), নাসিখ (বিধান রহিতকারী) ও মানসুখ (যার বিধান রহিত) আয়াত নিয়ে গবেষণা করা,
- এর জ্ঞানের প্রসার ঘটানো।
- এর প্রতি ও এর সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত সকল বিষয়ের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭)

রাসূল ﷺ এর প্রতি নসীহত বা নিষ্ঠা

রাসূল ﷺ এর প্রতি নসীহত বা নিষ্ঠার মানে হলো,

- তাঁর রিসালাতের সত্যায়ন করা,
- তাঁর আনীত সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা,
- তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা,
- জীবন ও মরণ সর্বাবস্থায় তাঁর দ্বীনের সহায়তা করা,
- তাঁর সাথে যারা ভালোবাসা রাখে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং তাঁর সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা,
- তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা,
- তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ বাস্তবায়ন করা,
- তাঁর দাওয়াত প্রচার করা,
- তাঁর সুন্নাহ'র প্রসার ঘটানো,
- এর প্রতি আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করা,
- সুন্নাহ তথা শরীআতের জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়া,
- এ বিষয়ে তাফাক্কুহ তথা গভীরতা অর্জন করা এবং অন্যকে এ পথে আহবান করা,
- জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষাদানে কোমলতা অবলম্বন করা এবং এর প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করা,
- হাদীস পাঠ করার সময় আদব রক্ষা করা ও না জেনে এ বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকা,
- এ জ্ঞানের ধারক-বাহকদের উক্ত জ্ঞানের সাথে সম্পর্কের কারণে শ্রদ্ধা করা,
- রাসল ﷺ এর চরিত্রে চরিত্রবান ও তাঁর শিষ্টাচার গ্রহণ করা,
- তাঁর পরিবার পরিজন ও সাথীবর্গকে ভালোবাসা,
- তাঁর সুন্নাহ'র মধ্যে যে বিদআতের প্রচলন ঘটায় অথবা তাঁর কোনো সাহাবীর সমালোচনা করে তার থেকে দূরে থাকা। (প্রাগুক্ত)

মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য নসীহত

মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি নসীহত বা নিষ্ঠার অর্থ হলো,

- সত্যের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা ও আনুগত্য করা,
- সৎকাজে পরামর্শ দেওয়া,
- অসৎকাজ থেকে নিবৃত করা,
- নরম ভাষায় উপদেশ দেওয়া,
- মুসলমানদের যে সমস্ত অধিকার সম্পর্কে তাদের গাফিলতি রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত করা,
- তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা,
- তাদের আনুগত্যের জন্য সাধারণ মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি নসীহত বা নিষ্ঠার মধ্যে আরো রয়েছে-

- তাঁদের পেছনে নামায আদায়করণ,
- তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা,
- তাঁদের নিযুক্ত প্রতিনিধির কাছে যাকাত (বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর) প্রদান করা।
- তাঁদের পক্ষ থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেলেই তাদের বিরুদ্ধে তরবারী কোষমুক্ত করে বিদ্রোহ না করা,
- তাঁদের মিথ্যা প্রশংসা পরিহার করা,
- তাঁদের সংশোধনের জন্য দুআ করা। (প্রাগুক্ত)

মুসলিম জনসাধারণের জন্য নসীহত

মুসলিম জনসাধারণের জন্য নসীহতের মানে হলো, সর্বাবস্থায় তাদের কল্যাণ কামনা করা, বিপদ-আপদে সহযোগিতা করা, তাঁদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করা ইত্যাদি।

মোদ্দা কথা, একজন মুসলিম হিসেবে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম জনসাধারণের প্রতি আমাদের বিভিন্ন হক বা অধিকার এবং বহু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এগুলো যথাযথভাবে আদায় করাই হলো সংশ্লিষ্টদের প্রতি নসীহত বা একনিষ্ঠতা। আল্লাহ আমাদের সকল ক্ষেত্রে খালিস তথা একনিষ্ঠ হবার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

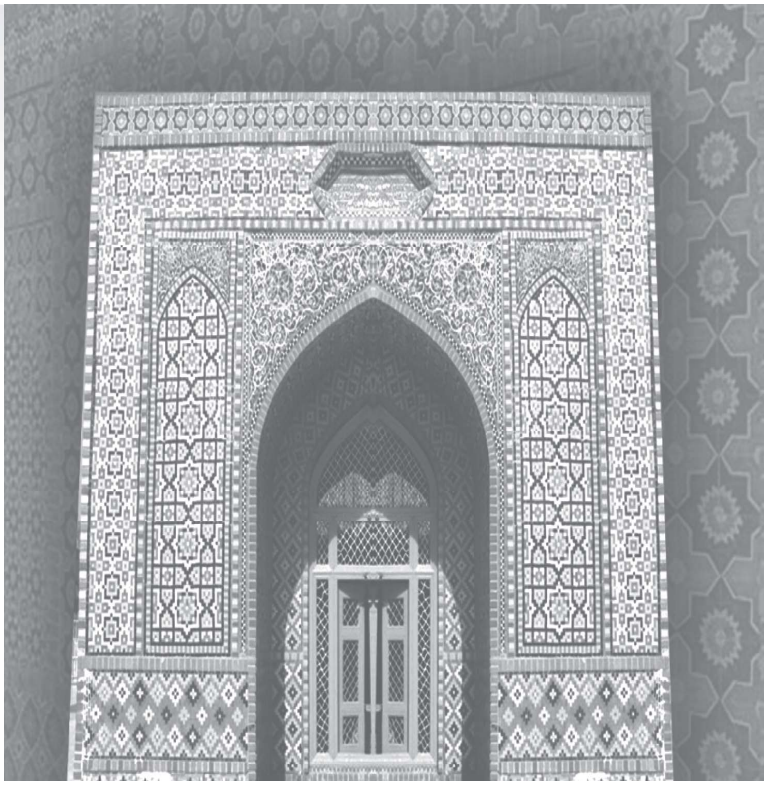

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)

মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

হযরত আলী (রা.) এর পারিবারিক জীবন

হযরত আলী (রা.) প্রথমে হযরত ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত ফাতিমা (রা.) এর গর্ভে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন জন্মগ্রহণ করেন। মুহসিন নামে আরো একজন ছেলে সন্তানের কথাও বর্ণিত আছে, যিনি ছোট বয়সে ইন্তিকাল করেন। আর যাইনাব কুবরা ও উম্মে কুলসুম নামে দুইজন মেয়ে সন্তান হযরত ফাতিমা (রা.) এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উম্মে কুলসুমকে হযরত উমর (রা.) বিবাহ করেছিলেন।

হযরত আলী (রা.) ফাতিমা (রা.) এর জীবদ্দশায় অন্য কোনো বিবাহ করেননি। রাসূল ﷺ এর ইন্তিকালের ছয় মাস পর ফাতিমা (রা.) ইন্তিকাল করেন। তারপর হযরত আলী (রা.) আরো বিবাহ করেছেন। হযরত আলী (রা.) এর জীবদ্দশায় তাঁর বিবিগণের কেউ কেউ ইন্তিকাল করেছেন এবং কেউ কেউ তালাকপ্রাপ্তা হয়েছেন। হযরত আলী (রা.) ইন্তিকালের সময় চারজন স্ত্রী রেখে গেছেন। হযরত আলী (রা.) এর চৌদ্দজন পুত্র ও সতেরো জন কন্যা সন্তান ছিলেন।

ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) এর পাঁচজন পুত্র থেকে বংশ চলমান। ১. হযরত হাসান (রা.) ২. হযরত হুসাইন (রা.) ৩. মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া ৪. আব্বাস ইবনুল কিলাবিয়া ৫. উমর ইবনুত তাগলিবিয়া। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩১-৩৩৩)

হযরত আলী (রা.) এর সাতজন পুত্র কারবালার যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। মাতৃপরিচয়সহ নিম্নে এ ৭ জনের নাম দেওয়া হলো- হযরত ফাতিমা (রা.) এর পুত্র হযরত হুসাইন (রা.), উম্মুল বানীন বিনতু হারামের চারজন পুত্র আব্বাস, জাফর, আব্দুল্লাহ ও উসমান। এ চারজনের মধ্যে কেবল আব্বাস ব্যতীত আর কারো উত্তরাধিকারী ছিলেন না। উম্মুল বানীনের এ চারজন পুত্রই ছিলেন। সকলেই কারবালায় শাহাদাতবরণ করেন। লাইলা বিনতে মাসউদ এর দুই পুত্র উবাইদুল্লাহ ও আবূ বকর।

খারিজী দল এবং হযরত আলী (রা.)

খারিজী বলা হয় ঐ দলটিকে যারা সিফফিনের যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে হযরত আলী (রা.) কে হাকিম মানতে বাধ্য করেছিল। তারপর এরাই বলতে লাগলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে হাকিম নিযুক্ত করা বৈধ নয়। এরপর তারা হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ ত্যাগ করে হারুরা নামক স্থানে চলে গেল। তাদের সংখ্যা ছিল বার হাজার। এ দলটি অতিশয় গোমরাহ এবং এদের সম্বন্ধে আল্লাহর নবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের সামুদ কওমের মতো ধ্বংস করে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এ দলের লোকেরা আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা.), আমীরুল মুমিনীন আলী (রা.), মুআবিয়া (রা.), আমর বিন আস (রা.) সকলের বিরুদ্ধে ছিল এবং সকলকে ইসলাম থেকে খারিজ এবং কতলযোগ্য মনে করত। (নাউযুবিল্লাহ)

তাদের বুনিয়াদী উসূল ছিল আল্লাহ ছাড়া কাউকেই হাকিম মানা কুফর। প্রত্যেক গুনাহ কুফর। প্রত্যেক গুনাহগার, যে তাওবা করেনি সে হত্যাযোগ্য। এরাই ইসলামে সর্বপ্রথম বিদআতী দল। তারা তাদের মনগড়া মতবাদের অন্ধ অনুসারী ছিল। মুসলমানদের রক্তপাতে তারা ছিল নির্ভীক। নিজেদের দল ছাড়া বাকি সকল মুসলমানকে তারা হত্যাযোগ্য মনে করত। যেহেতু সিফফীনের যুদ্ধ থেকে খারিজীদের উদ্ভব তাই খুব সংক্ষেপে সিফফীনের যুদ্ধ সম্বন্ধে এখানে আলোকপাত করা হলো।

সিফফীনের যুদ্ধ

সিফফীনের যুদ্ধ আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) এবং মুআবিয়া (রা.) এর মধ্যে সংগঠিত হয়। ৩৬ হিজরী সনে ফুরাত নদীর তীরে সিফফীনের ময়দানে উভয় দল মুখোমুখি হয়। আমীর মুআবিয়া (রা.) ফুরাতের পাড় ঘেষে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং পানির (নদীর তীরের) নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে হযরত আলী (রা.) এর সৈন্যদের জন্য পানি রুখে দেন। হযরত আলী (রা.) মুআবিয়া (রা.) এর কাছে সৈন্যদের জন্য পানি ব্যবহারের অনুমতি চাইলে আমীর মুআবিয়া (রা.) পানি দিতে অস্বীকার করলেন। তখন হযরত আলী (রা.) সেনাপতি মালিক আসতারকে জোরপূর্বক পানির উপর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার আদেশ দিলেন। পানির উপর যখন হযরত আলী (রা.) এর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো তখন হযরত আলী (রা.) মুআবিয়া (রা.) এর ফৌজকেও পানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দিলেন।

যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আলী (রা.) এর নির্দেশনা

সিফফীনের যুদ্ধের প্রাক্কালে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) সৈন্যদের কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিপক্ষ দল যতক্ষণ হামলা না করে ততক্ষণ হামলা করবে না। যুদ্ধে তাদের পরাজয় হলে পলাতক সৈন্যদেরকে ধাওয়া করবে না। যুদ্ধে আহত সৈন্যের মালামাল ছিনিয়ে নেবে না এবং পরাজিত কোনো সৈন্যের মালামালও আনবে না।

কয়েক মাস উভয় পক্ষে সাধারণ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকল। মুহররম মাসে যুদ্ধ বন্ধ রাখা হলো। সফর মাসে পুনরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এ যুদ্ধে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.), যিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবী, একেবারে প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন, তিনি হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে ছিলেন। হিজরতের পর মসজিদে নববী বানানোর সময় যখন হযরত আম্মার (রা.) সকলের চেয়ে বেশি পাথর বহন করেছিলেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, وَيْحَ عمَّارٍ تَقْتُلُه الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ -আম্মারের জন্য আফসোস! তাঁকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে (বুখারী)। যুদ্ধের পঞ্চম দিনে হযরত আম্মার (রা.) বের হলেন এবং আমীর মুআবিয়া (রা.) এর সৈন্যের মুকাবিলা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে মুআবিয়া (রা.) এর সৈন্যের হাতে শাহাদাতবরণ করলেন। হযরত আম্মার (রা.) এর শাহাদাতে হযরত আলী (রা.) খুবই মর্মাহত হলেন। মুআবিয়া (রা.)ও আফসোস করলেন। এমনকি আমর বিন আস (রা.) বললেন, হায়! আমি যদি বিশ বছর আগে মরে যেতাম (তবে ভালো হতো)।

হযরত আম্মার নিহত হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) এর সৈন্যগণ প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলেন। মুআবিয়া (রা.) দেখলেন পরাজয় অনিবার্য। তখন শর্ত সাপেক্ষে আপোষের প্রস্তাব পেশ করলেন। হযরত আলী (রা.) শর্তসাপেক্ষে আপোষ প্রত্যাখ্যান করলেন। দ্বিতীয় দিনে সিরিয়ার [মুয়াবিয়া (রা.) এর পক্ষের] সেনারা এক আজব দৃশ্যের অবতারণা করলো। তারা তাদের বর্শার উপর পবিত্র কুরআন ঝুলিয়ে ময়দানে অবতরণ করল। এমনকি মুআবিয়া (রা.) এর সেনাপতি মাথায় পবিত্র কুরআন রেখে হযরত আলী (রা.) এর সৈন্যদের সম্মুখে আসলেন। সিরিয়ার সেনারা বলছিল, এই কুরআন তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফয়সালা করবে। মালিক আল আশতার নিজ সৈন্যদেরকে বললেন এটি একটি কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। তারা বিশিষ্ট দলের উপর হামলা করে বসলেন। তখন হযরত আলী (রা.) এর সৈন্যদলের মধ্য থেকে আস বিন কাইস, মিসআর বিন ফাদাক, ইবনুল কুওয়া এবং আরো কয়েকজন সরদার বলতে লাগলো যে, এটি কেমন কথা যে আমাদের কিতাবুল্লাহর প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে আর আমরা তা প্রত্যাখ্যান করব। হযরত আলী (রা.) তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, এটি একটি ধোঁকা এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তখন তারা বলতে লাগল আপনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। মালিক আল আশতারকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখুন নতুবা আপনার পরিণতিও এমন হবে যেমন উসমান (রা.) এর হয়েছিল। তখন হযরত আলী (রা.) বাধ্য হয়ে মালিক আল আশতারকে যুদ্ধ বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন।

শেষ পর্যন্ত বিবদমান উভয় দল থেকে সালিশ নিযুক্ত করা হলো। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ থেকে আবূ মূসা আশআরী (রা.) এবং মুআবিয়া (রা.) এর পক্ষ থেকে আমর বিন আস (রা.)। এখন যারা যুদ্ধ বন্ধ করতে হযরত আলী (রা.) কে চাপ সৃষ্টি করেছিল তারাই বলতে লাগলো আল্লাহ ছাড়া কাউকে হাকিম মানা যায় না। হযরত আলী মানুষকে হাকিম মনোনীত করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন। এরূপ কথা বলে তারা হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ ত্যাগ করে হারুরা নামক স্থানে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করল এবং তাদের অধার্মিক কার্যকলাপ ও গোমরাহী প্রচারণা চালিয়ে যেতে লাগল।

খারিজীদের যুলম-অত্যাচার ও অধার্মিক আচরণ বাড়তে থাকল। হযরত আলী (রা.) তাদেরকে কোনোভাবেই হিদায়াতের পথে আনতে পারলেন না। তখন বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং তাদেরকে হত্যা করলেন। খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সকল সাহাবায়ে কিরামের পছন্দনীয় ছিল। রাসূল ﷺ আগেই এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তাকীদ দিয়েছেন এবং এদেরকে সামুদ কওমের মতো নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, পারস্পরিক সমস্যা সমাধানে হাকিম বা সালিশ নির্বাচন করার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। কোনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হলে এর মীমাংসায় আল্লাহ পাক দুজন সালিশ নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

-যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে যদি মীমাংসা চায় তবে আল্লাহ তাদের দুজনের মাঝে মিল করে দেবেন। (সূরা নিসা, আয়াত ৩৫)

খারিজী সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী

عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري ﷺ بَعَثَ عَلِيُّ بنُ أبِي طالِبٍ ﷺ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ مِنَ اليَمَنِ بذُهَيْبَةٍ في أدِيمٍ مَقْرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّلْ مِن تُرابِها، قالَ: فَقَسَمَها بيْنَ أرْبَعَةِ نَفَرٍ، بيْنَ عُيَيْنَةَ بنِ بَدْرٍ، وأقْرَعَ بنِ حابِسٍ، وزَيْدِ الخَيْلِ، والرّابِعُ: إمّا عَلْقَمَةُ وإمّا عامِرُ بنُ الطُّفَيْلِ، فَقالَ رَجُلٌ مِن أصْحابِهِ: كُنّا نَحْنُ أحَقَّ بهَذا مِن هَؤُلاءِ، قالَ: فَبَلَغَ ذلكَ النبيَّ ﷺ فَقالَ: ألا تَأْمَنُونِي وأنا أمِينُ مَن في السَّماءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّماءِ صَباحًا ومَساءً، قالَ: فَقامَ رَجُلٌ غائِرُ العَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، ناشِزُ الجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الإزارِ، فَقالَ يا رَسولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، قالَ: ويْلَكَ، أوَلَسْتُ أحَقَّ أهْلِ الأرْضِ أنْ يَتَّقِيَ اللهَ قالَ: ثُمَّ ولّى الرَّجُلُ، قالَ خالِدُ بنُ الوَلِيدِ: يا رَسولَ اللهِ، ألا أضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قالَ: لا، لَعَلَّهُ أنْ يَكونَ يُصَلِّي فَقالَ خالِدٌ: وكَمْ مِن مُصَلٍّ يقولُ بلِسانِهِ ما ليسَ في قَلْبِهِ، قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: إنِّي لَمْ أُومَرْ أنْ أنْقُبَ عن قُلُوبِ النّاسِ ولا أشُقَّ بُطُونَهُمْ قالَ: ثُمَّ نَظَرَ إلَيْهِ وهو مُقَفٍّ، فَقالَ: إنَّه يَخْرُجُ مِن ضِئْضِئِ هذا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ رَطْبًا، لا يُجاوِزُ حَناجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وأظُنُّهُ قالَ: لَئِنْ أدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ.

-আব্দুর রহমান বিন আবি নুআম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরীকে বলতে শুনেছি, একদা হযরত আলী ইয়ামান থেকে রাসূল ﷺ এর কাছে ছোট একখণ্ড অপরিশোধিত স্বর্ণ পাঠালেন, যা পাকা চামড়ায় বেষ্টিত ছিল। হুযূর ﷺ তা চারজন লোককে বণ্টন করে দিলেন। যারা ছিলেন উয়াইনা বিন বদর, আকরা বিন হাবিস, যাইদ আল খাইল এবং আলকামা অথবা আমীর বিন তুফাইল। তখন রাসূল ﷺ এর সাথিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমরা এদের চেয়ে (এ মালের) অধিকতর হকদার ছিলাম। একথা রাসূল ﷺ এর কাছে পৌঁছলে আল্লাহর নবী বললেন, সাবধান! তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে করো না? আমি তো তাঁর আমানতদার, যিনি আকাশে আছেন। আমার কাছে সকাল-সন্ধ্যা আসমান থেকে খবর

আসে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়ালো, যার চক্ষুদ্বয় কোটরগত, গণ্ডদ্বয়ের হাড় সম্মুখে বাড়ানো, কপাল উচু, ঘন দাড়িবিশিষ্ট, মুণ্ডিত মস্তক এবং লুঙ্গি ঈষৎ উঠানো। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহকে ভয় করুন। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ধ্বংস হও, আমি কি সমস্ত দুনিয়াবাসীর চেয়ে খোদাভীরুতার অধিকতর হকদার নই (অর্থাৎ সমস্ত জগতের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু)। অতঃপর লোকটি ফিরে চললো। তখন খালিদ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি একে হত্যা করব না? নবী ﷺ বললেন, না, হতে পারে সে নামায পড়ে। খালিদ বললেন, অনেক মুসল্লী এমনও আছে যারা মুখে যা বলে তা তার অন্তরে নেই। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি মানুষের অন্তর অন্বেষণের জন্য আদিষ্ট নই এবং পেট চিরে দেখার জন্যও নয়। অতঃপর রাসূল ﷺ লোকটি চলে যাওয়া অবস্থায় তার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ব্যক্তির নসল (বংশ) থেকে এমন এক কাওম (সম্প্রদায়) বের হবে, যারা কুরআন বেশি বেশি পাঠ করবে (তবে) তাদের তিলাওয়াত গলার নিচে পৌঁছবে না (অর্থাৎ তাদের তিলাওয়াত কলবে পৌঁছবে না)। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর শিকার অতিক্রম করে চলে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার ধারণা, রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি আমি এদের পাই তবে কওমে সামুদের মতো হত্যা করব। (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২৪)

কুরতুবী বলেছেন, এ লোকটি হত্যাযোগ্য অপরাধী হওয়ার পরও তাকে হত্যা করা হয়নি। কারণ, যাতে লোকেরা না বলে যে আল্লাহর রাসূল তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করেন। দ্বিতীয়ত সে নামায পড়ে।

বুখারী শরীফে অন্য হাদীসে আছে,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بينا النبيُّ ﷺ يقْسِمُ ذاتَ يَومٍ قِسْمًا، فَقالَ ذُو الخُوَيْصِرَةِ، رَجُلٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ: يا رَسولَ اللهِ اعْدِلْ، قالَ: ويْلَكَ، مَن يَعْدِلُ إذا لَمْ أعْدِلْ، فَقالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لي فَلأَضْرِبْ عُنُقَهُ، قالَ: لا، إنَّ له أصْحابًا، يَحْقِرُ أحَدُكُمْ صَلاتَهُ مع صَلاتِهِمْ، وصِيامَهُ مع صِيامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إلى نَصْلِهِ فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إلى رِصافِهِ فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إلى نَضِيِّهِ فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إلى قُذَذِهِ فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، قدْ سَبَقَ الفَرْثَ والدَّمَ، يَخْرُجُونَ على حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إحْدى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أوْ مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قالَ أبو سَعِيدٍ: أشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النبيِّ ﷺ، وأَشْهَدُ أنِّي كُنْتُ مع عَلِيٍّ حِينَ قاتَلَهُمْ، فالْتُمِسَ في القَتْلَى فَأُتِيَ به على النَّعْتِ الذي نَعَتَ النبيُّ ﷺ.

-আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ মাল বণ্টন করছিলেন। এমন সময় যুল খুয়াইসিরাহ নামক বনী তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ইনসাফের সাথে কাজ করুন। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ধ্বংস হও। আমি যদি ইনসাফ না করি তবে (সৃষ্টির মাঝে) কে ইনসাফ করবে? তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি একে হত্যা করে ফেলি। আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, না। এ ব্যক্তির এমন একদল সঙ্গী-সাথি রয়েছে তোমাদের একজন নিজের নামাযকে তাদের নামাযের তুলনায় নগণ্য মনে করবে এবং তাদের রোযার তুলনায় নিজের রোযাকে নগণ্য মনে করবে। এরা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে চলে যায়।... তাদের চিহ্ন হলো, তাদের মধ্যে একটি লোক হবে যার এক হাতে মহিলার স্তনের মতো অথবা গোশতের টুকরার মতো থাকবে, যা কাঁপতে থাকবে। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূল ﷺ থেকে এটি শুনেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আলী (রা.) এর সঙ্গে ছিলাম, যখন তিনি এদের সাথে (খারিজীদের সাথে) যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে নিহত খারিজীদের মধ্য থেকে তাকে খুঁজে আনা হলে রাসূল ﷺ যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পাওয়া গেলো। (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯১০)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খারিজীদের যুলম-অত্যাচার ক্রমে বাড়তে থাকে। হযরত আলী (রা.) তাদেরকে কোনোভাবেই হিদায়াতের পথে আনতে পারলেন না। ইতোমধ্যে সংবাদ আসলো যে, তারা সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন খাব্বাব (রা.) কে কতল করেছে। তাঁর অন্তসত্তা স্ত্রীকে যবাই করেছে এবং গর্ভস্থ সন্তানকে পেট কেটে বের করেছে। হযরত আলী (রা.) প্রথমে এ ঘটনার সত্যতা জানার জন্য হার্‌স বিন মুররাকে খারিজীদের কাছে পাঠালেন। খারিজীরা তাঁকেও হত্যা করে ফেলল। তখন হযরত আলী (রা.) সৈন্যবাহিনীসহ নাহরাওয়ান পৌঁছলেন। আমীরুল মুমিনীনের সৈন্য ও খারিজী দল যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হলো। হযরত আলী (রা.) হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) কে খারিজীদের জন্য নিরাপত্তা পতাকা উত্তোলন করার নির্দেশ দিলেন যে, যারা এ পতাকার তলে চলে আসবে তারা নিরাপদ। যারা কুফায় চলে যাবে তারা নিরাপদ। যারা মাদাইন যাবে তারাও নিরাপদ। এ ঘোষণার পর অনেক খারিজী তাদের দল ত্যাগ করে চলে গেল। তারা যুদ্ধের ময়দানে প্রথমে ছিল চার হাজার। দল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর থাকল ইবন কাসীরের বর্ণনায় প্রায় এক হাজার, তবে ইবন জারীরের তারীখে দুই হাজার আটশত বলা হয়েছে।

খারিজীরা তাদের ডান বাহুর নেতৃত্বে যাইদ বিন হাসান তাঈকে, বাম বাহুর নেতৃত্বে শুরাইহ বিন আউফাকে, অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে হামযা বিন সিনানকে এবং পদাতিক দলের নেতৃত্বে হারকুস বিন যুহাইর আস-সা'দীকে নিযুক্ত করল। তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় বলতে লাগলো, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য অগ্রসর হও। চল চল জান্নাতের দিকে চল।

হযরত আলী (রা.) এর সৈন্যসমাবেশে ডান বাহুতে হাজার বিন আদী (রা.), বাম বাহুতে শাবীস বিন রিবঈ ও মা'কাল বিন কাইস, অশ্বারোহী বাহিনীতে আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.), পদাতিক বাহিনীতে আবূ কাতাদা, মদীনাবাসী যারা সংখ্যায় সাতশত ছিলেন, তাঁদের বাহিনীতে কাইস বিন সা'দ বিন উবাদাকে নেতৃত্বে নিযুক্ত করা হলো।

প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। খারিজীগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণের সময় বলেছিল লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ। আরো বলছিল الرواح الرواح الى الجنة চল চল জান্নাতের দিকে চল। খারিজীগণ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। তারা প্রায় সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের সরদারগণ আবদুল্লাহ বিন ওহাব, হারকুস বিন যুহাইর, শুরাইহ বিন আউফ, আবদুল্লাহ বিন সাখবারা সালামী সকলেই নিহত হলো। হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে মাত্র সাতজন শাহাদাতবরণ করলেন।

নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারিজীগণ বিপর্যস্ত হলেও তারা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। পরবর্তীতে উমাইয়া হুকুমতকালে ও আব্বাসী খিলাফতকালে সময় সময় তারা সংগঠিত হয়ে হুকুমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। খারিজীরা যে একটি গোমরাহ দল এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য ছিল না। পরবর্তী মুসলমানদের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। রাসূল ﷺ এ দলটিকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

(চলবে)

সুবিচার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিশ্বজগতের জন্য মঙ্গল ও করুণারূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআন মাজীদের বিধানমত যে শাসন ব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে যে শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সেগুলোর মাধ্যমেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় জগতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সর্বাংশে সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর সে শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের অনুসরণ অনুকরণ করে আজ বিশ্বের শুধু মুসলমানই নয়, অমুসলিমরাও জাগতিক কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়েছে।

রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অসীম উদারতা, তাদের স্বার্থরক্ষা ও তাদের নাগরিক জীবনের পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দানের নিশ্চয়তা বিধান করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম অনুগত নাগরিককে অত্যাচার করবে, তার প্রাপ্য কম দিবে, তার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করবে, তাকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত তার কোনো বস্তু হস্তগত করবে, ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কিয়ামতের দিনে মহান আল্লাহর দরবারে সাক্ষী দেব।

বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে তিনি ঘোষণা করলেন, 'মানুষের জান, মাল ও ইযযত-আবরু এমনকি তার চামড়াটুকুও সুরক্ষিত থাকবে, পরস্পর কারুর দ্বারাই তার নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হতে পারবে না।'

তিনি সে ঐতিহাসিক নীতি নির্ধারণী ভাষণে মানুষের মৌলিক অধিকার, নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধা ভোগ এবং ন্যায়বিচার লাভে সবার সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করে বলেন, সকল মানুষের আদি পিতা সায়্যিদুনা হযরত আদম (আ.)। কাজেই মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারে সবাই সমান পরিগণিত হবে। আরব-অনারব, সাদা-কালোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আভিজাত্যের গর্বে তাঁর নিজের বংশ কুরাইশ গোত্র সবচেয়ে বেশি অগ্রসর ছিল। পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি সেই কৌলিন্য ও আভিজাত্যের মূলে কুঠারাঘাত করে অভিজাত-অনভিজাত, উঁচু-নীচু ইত্যাদির ব্যবধানে যে বিচার ব্যবস্থার পার্থক্য প্রচলিত ছিল তার উচ্ছেদের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে সবাই সমান বলে ঘোষণা দিয়ে মানুষের সামাজিক সাম্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অসীম উদারতা, তাদের স্বার্থরক্ষা ও তাদের নাগরিক জীবনের পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দানের নিশ্চয়তা বিধান করে তিনি ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম অনুগত নাগরিককে অত্যাচার করবে, তার প্রাপ্য কম দিবে, তার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করবে, তাকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত তার কোনো বস্তু হস্তগত করবে, ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কিয়ামতের দিনে মহান আল্লাহর দরবারে সাক্ষী দেব। মিশকাত শরীফের এ বর্ণনা ছাড়াও সহীহ বুখারী শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে, অমুসলিম অনুগত নাগরিককে যে মুসলিম হত্যা করবে, সে বেহেশতের গন্ধও পাবে না।

নিঃস্ব-নিরাশ্রয়, ইয়াতীম, বিধবা, অসহায়, রোগগারে অক্ষম, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে যে কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন, পরবর্তী শাসক প্রশাসকদের জন্যও তিনি সঠিক নির্দেশনা দিয়ে এ বিষয়ে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রথম যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে বা পরিশোধের ব্যবস্থা না করে মারা যেতেন তিনি তার জানাযার নামায পড়তেন না। তারপর বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষণা করলেন, যে কোনো অসহায় ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ঋণ গ্রহণ করে তা পরিশোধে অক্ষম অবস্থায় মারা যাবে, কিংবা নিরাশ্রয় ইয়াতীম বিধবা রেখে যাবে, তার সে ঋণ পরিশোধ করা এবং ইয়াতীম বিধবার প্রতিপালন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আমার যিম্মায় থাকবে। বাইতুল মাল বা সরকারি ধন ভাণ্ডারের প্রথম ব্যয় বরাদ্দই তার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

জনগণের শিক্ষা দীক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ বিষয়ে বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যে রাষ্ট্রনায়ক জনগণের শাসনভার গ্রহণ করেন (যেহেতু তিনি জনগণ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন) তিনি জনগণের সম্পর্কে দায়ী থাকবেন।

ক্ষমতাসীন হয়ে জনগণের প্রয়োজনের আড়ালে থাকা যাবে না। মিশকাত শরীফে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম জনগণের শাসন ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে যে ব্যক্তি তাদের অভাব-অভিযোগ হতে আড়ালে থাকবে, আল্লাহ পাক তার অভাব-অভিযোগ থেকে আড়ালে থাকবেন।

শাসন পরিচালককে অবশ্যই ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি দশজন

লোকের উপর ক্ষমতাধিকারী, তাকেও বিচারের দিনে গলায় শিকল বাঁধা অবস্থায় হাশরের মাঠে হাযির করা হবে। তারপর ন্যায়পরায়ণতা তাকে মুক্ত করবে, অন্যথায় তার অত্যাচার-অবিচার তাকে ধ্বংসের নরকে পতিত করবে।

তিনি আরো বলেছেন, কিয়ামতের দিনে মহান আল্লাহর দরবারে অধিক নৈকট্য লাভকারী ভালোবাসার পাত্র হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। আর সবচেয়ে বেশি গযবের পাত্র এবং আযাবে পতিত হবে অত্যাচারী শাসক।

তিনি এও বলেছেন যে, উত্তম শাসক তারাই, জনগণ যাদেরকে ভালোবাসে এবং যাদের জন্য দুআ করে, তারাও জনগণকে ভালোবাসে এবং তাদের জন্য দুআ করে। আর নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত শাসক তারা, যাদের প্রতি জনগণ বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিশাপ করে এবং অভিশাপ দেয় অর্থাৎ শাসকবর্গকে অবশ্যই জনগণের আস্থাভাজন ও প্রিয় হতে হবে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবী হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা.) কে ইয়ামানের গভর্ণর পদে নিযুক্তি দিয়ে সেখানে পাঠাবার সময় উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, বিলাসিতার জীবন সযত্নে পরিহার করে চলবে। মহান আল্লাহর খাঁটি বান্দাহগণ বিলাস প্রিয় হয় না। আরো বললেন, আমার অনুমতির বাইরে কোনো প্রকার ব্যয়বাহুল্য করবে না। ঐরূপ ব্যয় খিয়ানত বা সরকারি অর্থের আত্মসাত বলে গণ্য হবে। কিয়ামতের দিনে ঐ খিয়ানতের বোঝা ঘাড়ে করে হাশরের মাঠে কঠিন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই শাসন-প্রশাসনে যারা থাকবে তাদেরকে অবশ্যই সহজ-সরল, ভোগ-বিলাসহীন, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতে হবে।

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তাঁর জীবন-যাপন পদ্ধতির অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য এবং সৌভাগ্যের কথা। তিনি কত বিজয় লাভ করেছেন। লক্ষ কোটি টাকার সরকারি আয় তাঁর হাতে ব্যয়িত ও বণ্টিত হয়েছে। সবই তিনি জনগণের জন্য ব্যয় করেছেন।

তাঁর পুরো জীবনটাই অনুকরণযোগ্য আদর্শের মহাগ্রন্থ। তাঁর বাসগৃহ ছিল মরা খেজুর গাছের খুটি, খেজুর পাতার ছাউনী দিয়ে তৈরি। তাতে দাঁড়ালে উপরের ছাউনিতে মাথা ঠেকে যেত। উপর দিকে তাকালে ছাউনির ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যেত, খেজুর পাতার চাটাই ছিল তাঁর বিছানা। দরজায় লোমের চট লটকানো ছিল সোজা হয়ে শুইলে মাথা ও পা দুদিকের দেওয়ালে ঠেকে যেত। তাঁর গৃহের উনুনে মাসেককাল পর্যন্ত আগুনও জ্বলতোনা। পরিবারবর্গসহ তিনি শুধুমাত্র খেজুর ও পানির দ্বারা ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতেন। অনেক সময় যবের রুটি দিয়েই চলত। গমের আটা এবং গোশত খুব কমই মিলতো। পাতলা চাপাতি রুটি কখনো ঘরে তৈরি হতো না। পরনের কাপড়ে নিজ হাতে তালি লাগাতেন। ছেঁড়া জুতা নিজ হাতেই সেলাই করে মেরামত করতেন। এরূপে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের হাজারো নযীর রয়েছে আমাদের প্রিয়নবীর জীবনে।

বিজাতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যখন মহান আল্লাহর আদেশ তিনি পেলেন, তখন নেহায়েত আত্মরক্ষার জন্যই তিনি সাহাবায়ে কিরামকে জিহাদ অভিযানে প্রেরণের সময় উপদেশ দিতেন, মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে তারই দ্বীনের জন্য জিহাদ করবে। মহান আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করবে। কোনো কিছু আত্মসাত করোনা। বিশ্বাসঘাতকতা করো না। নাক-কান কেটে দুশমনকে কষ্ট দিয়ো না। শিশুহত্যা করো না। নারীর উপর অত্যাচার করো না। বৃদ্ধলোকদের উপর খড়্গ হস্ত হয়ো না। অসুস্থ-পঙ্গু এবং অন্ধ লোকের উপর আক্রমণ করো না। বসতবাড়ি এবং ফসলের ক্ষেত্রে আগুন দিয়ো না। গৃহপালিত পশু-পাখির উপর হাত তুলবে না।

একজন প্রাদেশিক শাসককে তিনি এ বলে উপদেশ দিয়ে পাঠালেন যে, কারো প্রতি অন্যায় অত্যাচার করে তার বদদুআর পাত্র হয়ো না। মযলুমের বদদুআ সরাসরি আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌঁছে থাকে। কাজেই ক্ষমতার দাপটে কারো প্রতি অবিচার করা ঠিক হবে না। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য এবং সত্য বুঝার সুযোগ দিয়ে শত্রুর প্রতি উদার থাকতে এবং শত্রু নিধন অপেক্ষা শত্রুকে সংশোধন হওয়ার সুবিধা দিতেই তিনি তাঁর প্রেরিত বাহিনীকে উপদেশ দিতেন। খাইবার যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রা.) কে আদেশ করলেন, ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হবে। শত্রুর অবস্থানের নিকট পৌঁছে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবে। ইসলাম গ্রহণ না করলে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারের প্রস্তাব করবে। তাতেও তারা সাড়া না দিলে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ শুরু করবে। তখনো স্বরণে রাখবে তোমার মাধ্যমে যদি কোনো এক ব্যক্তিও মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ ও সৎপথের দিশা পায়, তবে তা তোমার জন্য সর্বোচ্চ সম্পদের তুলনায় অধিক সৌভাগ্যের কারণ হবে।

শান্তির খাতিরে শত্রুর সাথে আপোষ-মীমাংসায় চরম ধৈর্য ও পরমত উদারতার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধি উপলক্ষে বিরাট শক্তি-সামর্থের অধিকারী হয়েও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুপক্ষের অন্যায় জেদের সম্মুখে শত উস্কানীর মুখে উদারতা ও চরম ধৈর্য সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শুধুমাত্র শান্তি স্থাপন ও আপোষ-মীমাংসার জন্যই তিনি তা করেছেন।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বজনপ্রীতির বিপরীতে স্বজনদের উপর সর্বাগ্রে আইন প্রয়োগ করতে শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিদায় হজ্জের ভাষণে অন্ধকার যুগের রীতি-নীতির উচ্ছেদ এবং ইসলামী আইনের প্রবর্তন ঘোষণায় তিনি বললেন, বংশ, গোত্র ও অঞ্চল হিসেবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত ও বেআইনী ঘোষিত হলো। হত্যাকারী ভিন্ন অন্য কাউকে খুনের দায়ে দায়ী করা যাবে না। সেই মুহূর্তে তিনি ঘোষণা করলেন, আমার বংশ কুরাইশের একটি খুনের প্রতিশোধ প্রাপ্য রয়েছে হুযাইল গোত্রের উপর। ইসলামী আইন ঘোষণায় আমি সর্বপ্রথম সে প্রতিশোধ বাতিল ঘোষণা করলাম। ঠিক তেমনিভাবে সুদ প্রথা বাতিলের ঘোষণার সাথে সাথে ঐ মুহূর্তেই পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করলেন, সর্বপ্রথম আমার চাচা আব্বাস (রা.) এর সুদী ব্যবসার যাবতীয় সুদ বাতিল বলে ঘোষণা করলাম।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিজেদের বেলায় অধিক কঠোর হতে হবে। আইনের বিচারে আপন-পর সকলকে সমান নযরে দেখতে হবে। এ হলো মহানবীর মহান আদর্শ। মক্কা শরীফ যখন বিজিত হয়, সে সময়ে এক কুরাইশ রমনী চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়। ইসলামী শরীআতী আইনে হাত কাটার ভয়ে কুরাইশগণ বিচলিত হয়ে নবীয়ে পাকের দরবারে সুপারিশ করে। সে সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে মহান আল্লাহর পিয়ারা রাসূল জনসমাবেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয় আল্লাহর কসম বিনা দ্বিধায় আমি তারও হাত কেটে দেব।

আইন প্রয়োগ এবং শাসন পরিচালনায় কঠোরতা এড়িয়ে সহজ পন্থা এবং আইনের প্রতি জনগণকে বীতশ্রদ্ধ না করে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করাই নবীজির শিক্ষা।

কল্যাণ ও মঙ্গলময় সুবিচার প্রতিষ্ঠায় এমন শিক্ষা ও আদর্শ আর জগতে নেই। অমুসলিমরাও নবীজির এ আদর্শের অনুসরণে অনেক জাগতিক-পার্থিব কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়েছে।

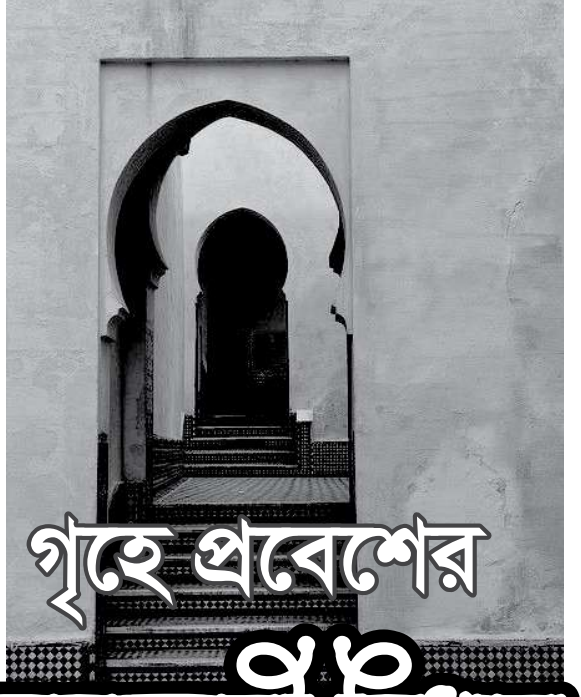

গৃহে প্রবেশের কুরআনী বিধান

খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন অপরাধ নিবারণের প্রশ্নেই কেবল তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেননি– সমাজের নাজুক দেহ হতে বিবিধ দুর্নীতি ও সামাজিক কুপ্রথারও বিলোপ সাধনে বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। আল্লাহর বাণী দিনের পর দিন অবতীর্ণ হয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে পথপ্রদর্শন করত। মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার, প্রতিবেশীর অধিকার আদায় ও অন্যান্য সামাজিক আচরণ সম্পর্কে ইসলাম মুসলমানদেরকে কী শিক্ষা দেয়, হযরত অহরহ সাহাবায়ে কিরামকে তাও বাতলাতে থাকেন। তেমনি সমাজের একটি মারাত্মক ব্যাধি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বাণী তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না গৃহবাসীর সম্মতি লাভ করো এবং তাদের সালাম প্রদান করো। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। যদি সেই গৃহে কেউ উপস্থিত না থাকে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকবে, যতক্ষণ না গৃহের অধিবাসীদের নিকট হতে প্রবেশের অনুমতি মিলে। যদি তারা ফিরে আসতে বলে, তবে ফিরে আসবে। এতে তোমাদের জন্য বেশি পবিত্রতা রয়েছে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। (সূরা নূর, আয়াত: ২৭-২৮)

এই ব্যবস্থার তখন প্রয়োজন ছিল এজন্য যে, দর্শনপ্রার্থী লোকেরা অনেক সময় ঘরের ভেতর সরাসরি প্রবেশ করত, এতে তারা বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতো। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনেক সময় এরূপ দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে। বর্তমানে আধুনিক যুগেও কি এই কুপ্রথা প্রচলিত নয়? আমাদের সমাজে এক শ্রেণির লোক আছে যারা গৃহস্বামীর অনুমতির কোনো প্রয়োজনবোধ করে না এবং বিনা বাধায় তার ঘরে প্রবেশ করে, বন্ধু-বান্ধব কিংবা পরিচিত লোকদের ঘরে এভাবে প্রবেশ করা তাদের কাছে কোনো দোষের ব্যাপার বলে পরিগণিত হয় না। অথচ সামাজিক দিক দিয়েও এরূপ কাজ করা জঘন্য অন্যায়।

আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন, হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের দাস-দাসীগণ এবং যারা সাবালক হয়নি এমন সকলেও যেন তোমাদের নিকট তিনটি সময় অনুমতি গ্রহণ করে- ১. ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে ২. যখন তুমি মধ্যাহ্নের উত্তাপবশত গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করে ফেল এবং ৩. ইশার সালাতের পর অর্থাৎ রাত্রি অধিক হলে। এই তিনটি সময় হচ্ছে তোমাদের জন্য পর্দা বা দৈহিক গোপনীয়তা রক্ষার সময়। অন্য সময় এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করলেও তোমাদের বা প্রবেশকারীর পাপ হবে না। তোমাদের ভেতর কতক লোককে বাধ্য হয়ে অপরের নিকট যেতে হয় এবং নানা কাজে সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে হয়। তাই আল্লাহ এ সম্বন্ধে তার বাণী পরিষ্কারভাবে তোমাদেরকে অবহিত করছেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তোমাদের ভেতরে যেসব সন্তান বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে তারাও যেন উক্তরূপে অনুমতি গ্রহণ করে, এভাবে আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কারভাবে তাঁর বাণী জ্ঞাপন করছেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নূর, আয়াত: ৫৮-৫৯)

কিন্তু ধর্মীয় বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞ এক শ্রেণির লোক সময়-অসময় কিছুই চিন্তা করে না, যখন ইচ্ছা তখনই অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করে। এমনকি মহিলাদের কক্ষেও প্রবেশ করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর আজকাল তো এটা একটি স্বাভাবিক রীতি-নীতিতে পরিণত হতে চলেছে।

আল্লাহ পাক আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে বলেছেন, ঈমানদার পুরুষদেরকে বলো, তারা যেন দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থান সংযত রাখে। এটা তাদের জন্য উত্তম; নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।

ঈমানদার নারীদেরকেও বলো তারা যেন সংযত দৃষ্টিতে চলে এবং তাদের আবরু অর্থাৎ লজ্জাস্থানসমূহ ঢেকে চলে ও তারা যেন সাধারণত যতটুকু প্রকাশ না পেলে চলে না ঠিক তার বেশি তাদের অলঙ্কার ও সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষস্থলে টেনে দেয় এবং তাদের সজ্জা স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্রগণ, দেবর, সন্তানগণ, ভাইগণ ও ভাইয়ের সন্তানগণ, ভগ্নীর সন্তানগণ এসকল আত্মীয়ের স্ত্রীগণ এবং দাসীগণ এবং সেসব পুরুষভৃত্য যাদের ভিতর নারীর স্পৃহা এখনও জাগেনি এবং শিশুগণ যারা নারীর নগ্ন সৌন্দর্য কী তা বুঝতে পারে না এরা ব্যতীত অপর কারো সম্মুখে প্রকাশ না করে। তারা যেন মাটিতে এত জোরে পদক্ষেপ না করে যাতে তাদের অলঙ্কারের শব্দে অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিশ্বাসীগণ, প্রত্যেকে (অন্যদিক হতে) আল্লাহর দিকে মনকে ফিরাও যাতে তোমরা জীবনে কৃতকার্য হতে পারো। (সূরা নূর, আয়াত: ৩০-৩১)

পাশ্চাত্য ভাবধারায় অন্ধ হয়ে আজ যারা বিপথগামী হচ্ছে, কুরআনের উপরোক্ত বিধি ব্যবস্থাদির প্রতি তারা কি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে সচেষ্ট হবেন?

মহাকবি আল্লামা ইকবাল: খুদী ও ইসলামী ঐক্য

আবদুল মুকীত চৌধুরী

এক.

খুদী

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহাকবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের কাব্যজগতে, তাঁর চিন্তাধারায় 'খুদী' – 'নিজত্ব' বা আপন সত্তার 'অস্তিত্ববাদ' একটি প্রধান বিষয়। অস্তিত্ববাদে 'রূহ' বা 'সত্তা'র স্বরূপ উপলব্ধি পূর্বশর্ত। 'খুদী'র চেতনার উৎসে ইকবাল বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বশেষ কিতাব বিশ্বজনীন কুরআন মাজীদের কালাম পাকের শাশ্বত আলোয় দৃষ্টি রেখে উপলব্ধি করেন, আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞাত আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই নিজেকে প্রত্যাশিত সীরাতাল মুস্তাকীমে পরিচালিত করতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে আমরা–প্রাসঙ্গিক ভাবা যেতে পারে, এমন কয়েকখানা আয়াতের বাংলা অনুবাদ উল্লেখ করছি : "আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৩)। "বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়াশীল, পরম দয়ালু" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১)। "স্মরণ করুন আপনার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি তো সৃষ্টি করবো পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি ..... তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না" (সূরা বাকারা, আয়াত ৩০)। "আর তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন : রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত, আর এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮৫)। "আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহ্র রঙ। রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর ? এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৩৮)। "কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন" (সূরা ফুরকান, আয়াত ১) এবং "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৬)।

মহাকবি ইকবাল তাওহীদ, রিসালত, পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি সৃষ্টি, রূহ, আল্লাহ্র রঙে রঙীন হওয়া, সত্যাসত্যের পার্থক্য নিরূপণকারী 'ফুরকান' অবতীর্ণকরণ এবং মানব জীবনের পরিণতি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন, বিজ্ঞ ছিলেন। তাওহীদ–আল্লাহ্র একত্ববাদের আওতায় ব্যক্তি-মনস্কতায় বহুত্ববাদের সাংঘর্ষিক চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত আমিত্বের বৈশ্বিকতার স্বচ্ছন্দ বিকাশ, আল্লাহ্কে ভালবাসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অনুসরণের নির্দেশ, আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধিত্বের গুরু দায়িত্ব পালনে বান্দার প্রতি তাঁর আস্থা, আল্লাহ্র আদেশঘটিত রূহের বহিরাবরণ বা অবয়বে ও উর্দ্ধমুখী পবিত্রতায় মানুষের আনুগত্যের অবস্থান, আল্লাহ্র রঙে রঙীন হওয়ায় সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব চেতনায় ধারণ, কুরআন-ফুরকানে সত্য মিথ্যার পার্থক্যের দিক নির্দেশনা চেতনায় ধারণ এবং আল্লাহ্র কাছ থেকে আসা ও তাঁর কাছে প্রতাবর্তনে চূড়ান্ত জবাবদিহিতার প্রেক্ষিতে স্ব-স্ব জীবনে সত্যে অটল থাকা এবং মনযীলে পৌঁছতে রাব্বুল 'আলামীনের দয়া ও নাজাতের আশা বান্দার হৃদয়ে থাকবে, এটাই এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত।

ফার্সীতে ইকবালের দু খানা বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'আসরারে খুদী' (১৯১৫) ও 'রমূযে বেখুদী' (১৯১৮)। ড. নিকলসন 'Secrets of the Self' নামে ১৯২০ সালে 'আসরারে খুদী'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। কবির খ্যাতি পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়ে। আত্মিকতার আধুনিক ব্যাখ্যা-সমৃদ্ধ এই কাব্যে কবি 'খুদী' তথা 'আত্মবিকাশে'র দর্শনে মুসলিম উম্মাহসহ মানবিকতা সন্ধানী বিশ্বমানবের জন্য চেতনার উন্মেষ সহায়ক বাণী রেখে গেছেন। মানব সত্তার যথার্থতায় পৌঁছানোর জন্য এ কাব্য আত্মপ্রসারণের এক আলোকবর্তিকা। অস্তিত্বের সত্তা ও মানবিক অস্তিত্ব বিষয়ক এই চিন্তাধারাই 'অস্তিত্ববাদ' (Existentialism)।

এখানে মানুষ নিজ কর্মের জন্য দায়ী ও আপন নিয়তি নির্ধারণের জন্য স্বাধীন। ইকবাল বলেন : "In any case, we can begin by saying that Existentialism in our sense of the word, is a doctrine that does render human life possible : a doctrine also which affirms that every truth every action employ both an environment and human subjectivity."

ইকবাল দর্শনের মূলে কুরআনে প্রত্যবর্তনের চিন্তাধারা। মানবসত্তার জন্য শ্রেষ্ঠ দিক নির্দেশক এই ইলাহী কালামের উৎস থেকেই তাঁর 'খুদীর' আহ্বান। তাঁর বিশ্বাস, ইসলামেই মানুষের ব্যক্তিসত্তার জাগৃতি ও পূর্ণ বিকাশের শ্রেষ্ঠ আনুকূল্য রয়েছে। ইকবাল বলেন, "আল্লাহ্‌র বিধান, তাঁর আদেশ এবং নিষেধ প্রতিপালনের উপর মানুষের সর্বপ্রকার উন্নতি এবং কল্যাণ নির্ভর করে।" ইকবালের কাব্যসাহিত্য ছাড়া তাঁর গদ্যসাহিত্যে, পত্রাবলীতেও 'খুদীর' উজ্জীবনের আহ্বান রয়েছে।

'রূহ' আল্লাহ্‌র 'আদেশ ঘটিত' হওয়ায় কুরআনে নিষিদ্ধ কাজগুলোর বিপরীতে মোক্ষম প্রতিপক্ষ হওয়ার স্বীকৃতি প্রাপ্ত। রূহের প্রবণতা সৃষ্টিসূত্রেই আল্লাহমুখী। এ জন্য মিথ্যাচার ও অমানবিকতা তথা সকল পাশবিকতার বিপরীতে 'রূহ' তথা 'খুদীর' অব্যাহত মুকাবিলা ও বিজয়ী হওয়া শুধু প্রত্যাশিত নয়, অনিবার্যও। সুতরাং মানুষের লক্ষ্য হবে 'খুদী'র অস্তিত্ববাদের বিকাশে অতন্দ্র থাকা। 'খুদীর' সুষ্ঠু বিকাশে ইকবালের আহ্বান :

"আশেক হও মাশুকের অনুরাগে তোমার,
যেন তুমি করতে পার পক্ষ সঞ্চালন
পৌঁছতে নৈকট্যে আল্লাহ্‌র।
আত্মার দ্বারা হও বলবান,
আত্মার দিকে কর প্রত্যাবর্তন,
ভেঙে দাও মস্তক লাত ও ওজ্জার–
ইন্দ্রিয়পরতার।"

'খুদীর' ব্যাপ্তিতে তাকদীরের প্রত্যাশিত অবস্থানে পৌঁছতে ইকবালের বহুল আলোচিত আহ্বান :

"(তোমার) খুদীর কর বিকাশ এমন,
যেন যখন হয় ভাগ্য বণ্টন
জিজ্ঞেস করেন স্বয়ং খোদা বান্দাকে,
রাজী আছো তুমি এতে, আছে সমর্থন ?"

ইকবালের মুনাজাত –

"জাগ্রত আশা অন্তরে দাও হে খোদা মুসলিমের,
আত্মা তাদের ব্যথিয়ে উঠুক, চঞ্চল হোক ফের।
ফারান গিরির প্রতি ধূলিকণা হোক পুনঃ রওশন
জাগাইয়া দাও আবার তাদের আগ্রহ জীবনের।"
– তরজমা : গোলাম মোস্তফা

দুই.

ইসলামী ঐক্য

ইসলামী ঐক্য সম্পর্কে মহাকবি আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাধারা আলোচনায় আমরা কুরআন মাজীদের এক দিক-নির্দেশক আয়াতের অংশবিশেষের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি : "তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র রজ্জু (কুরআন ও ইসলাম) দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ....." (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩)। এটা স্পষ্ট, মুসলিম ঐক্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাম্য। এ প্রেক্ষিতেই এ আদেশ। পবিত্র হাদীস অনুযায়ী মুসলিম মিল্লাত বিভিন্ন অঙ্গের ব্যথায় সহমর্মী একটি দেহের মত। ইকবালের কাব্যে পবিত্র আয়াতের মর্মবাণী ইসলামী ঐক্যের কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে। ইকবালের কাব্য-কুশলতা, শিল্পসৌকর্য ও উপস্থাপনার অনন্যতাও বিশ্বস্বীকৃত। তাঁর কাব্যকর্ম কালামে ইলাহীর উৎসের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার্য। তাঁর বাণীর ওহী-ভিত্তিকতা উৎসের পবিত্র অবস্থানের ইঙ্গিতবাহী। আল্লাহ্ তাআলার শাশ্বত কালামের সাথে কবি ও কবিতার নৈকট্য ও একাত্মতা এবং এর গভীরতা এখানে প্রতিপাদ্য।

এখানে প্রাক-বিবেচনার আরেকটি দিক হচ্ছে, ইসলামী ঐক্য ও মানব সংহতি এ দুটি বিষয় সাংঘর্ষিক তো নয়ই; বরং পরস্পর সম্পূরক। ইসলামী ঐক্য মানব জাতির সংহতি ও ঐক্যের সূচক ও ব্যবস্থাপক। মানব জাতির এক পরিবার সদৃশ বাঞ্ছিত অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
"সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত" (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৩)। মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে- যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।" জাতি-গোত্রের বিভক্তি 'পরস্পর পরিচিতি'র জন্য। এতে সংঘাত, হানাহানি কাম্য নয়।

এজন্য ইসলামী ঐক্যের চিন্তাধারাকে মানব সংহতির বিপরীতে প্রতিবন্ধক মনে করার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতনতা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদের যেমন প্রয়োজন, তেমনি নেতিবাচকতা-মুক্ত নিছক অজ্ঞজনদের সঠিক ধারণা সৃষ্টিও অবশ্য প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কিছু মুসলিম এ ধরনের বিভ্রান্তি ও উন্নাসিকতার শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে বাইরে এ অবমূল্যায়ন লালনের অবকাশ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এর কিছুটা অজ্ঞতা-নির্ভর; আবার কিছুটা তাত্ত্বিকতার আবরণে উদ্দেশ্যমূলক। ঘরের এমনতরো চিন্তাধারার লোকসহ বাইরের বিভ্রান্তদের সংকীর্ণ মূল্যায়ন প্রবণতাকে মার্জিত ভাষায় নিছক কল্পনাপ্রসূত বলা যায়। ইসলামের প্রধান উৎস কুরআন মাজীদ এবং দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিকোণের সাথে এ চিন্তার দূরতম সম্পর্কও নেই। স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দূরত্বের কোন বিভাজন-রেখা টানার ক্ষেত্র এটি নয়। বিশ্বমানব পরিবারের একাত্মতায় বিশ্বাসী ইসলামী ঐক্য-চিন্তার প্রবক্তা ও অনুসারীদের দ্বারা কথিত সংঘাতমূলক পরিবেশ পরিস্থিতি রচনার অবকাশ বা সম্ভাবনাই নেই। প্রসঙ্গটি এজন্য যে, সমকালীন বিশ্বে মুসলিম ঐক্য ও পুনরুত্থান সম্পর্কে এ ধরনের একটি অপপ্রচার পল্লবিত রয়েছে এবং এর বিপরীতে মুসলিম তাত্ত্বিকদের স্বকীয় ভাষ্যগত অবস্থান তেমন জোরালো নয়, অনেকটা নিষ্প্রভ এবং ক্ষেত্রবিশেষে কৈফিয়তধর্মী। আত্মপক্ষ সমর্থনের মৌলিক অবস্থান কালামে ইলাহী এবং প্রদর্শনমূলক বাস্তবতা সু-উদার সাম্য ও মৈত্রীর সমন্বয়ধর্মীয় মুসলিম ইতিহাসের গরীয়ান ঐতিহ্য। কথা একটাই, মুসলিম ঐক্য সর্বমানবীয় সংহতির লক্ষ্যে একান্ত বাঞ্ছিত পদক্ষেপ, এ সম্পর্কে যথাযথ কারণ ছাড়া ভিন্ন ধারণা ভিত্তিহীন।

প্রাসঙ্গিক, সাহিত্যকর্মে ইকবাল পবিত্র কুরআন সুন্নাহ্‌র উৎস-নির্ভর হওয়ায় সম্প্রদায়গত সীমিতি তাঁর অবদানকে ম্লান করে কি না এবং তাঁর সাহিত্য মূল্যায়নে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা আরোপযোগ্য কি না! জিজ্ঞাসাটি যদিও ইসলামের বিশ্বজনীন দৃষ্টিকোণ ও মুসলিমদের সহজাত অসাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত, তবু অনেকটা প্রচলিত

এ বিভ্রান্তি সম্পর্কে বক্তব্য প্রয়োজন। আমরা অনেকেই জানি, বিশ্বের কালজয়ী কবি-সাহিত্যিকরা ঐতিহ্যবাদী ছিলেন। রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্যের এ দিকটি বাংলা সাহিত্যে ইকবালের সমকালেই দৃশ্যমান। 'কেন ইকবাল' প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্র সাহিত্যে ঐতিহ্য প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "তবে ইকবালই বা কেনো ভাবতে পারবেন না যে, কুরআনের মধ্যে থেকে গেছে অনেক সমাধান-সূত্র?" তাঁর বক্তব্যে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন রয়েছে। তবে, 'অনেক সমাধান-সূত্র'ই শুধু নয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মূল্যায়নে 'সার্বিক সমাধান-সূত্র' মানুষ পেতে পারে কুরআনে। আল্লামা ইকবাল তাই বিশ্বাস করতেন। এজন্য ইসলামী ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ্‌র কালামের সমাধান-সূত্র ধরে। পাশাপাশি এ মহান পথের নানা অন্তরায় চিহ্নিত করেছেন তাঁর সাহিত্যসম্ভারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক মহান মুজতাহিদতুল্য ভূমিকায় তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন, পথ দেখিয়েছেন আত্মঘাতী, সংঘাত-জর্জর পথবিচ্যুত বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীকে।

'জওয়াবে শিকওয়া'-য় ইকবালের সংহতির উচ্চারণ :

লাভ লোকসান এক তোমাদের, এক মঞ্জিল, এক মোকাম,
এক তোমাদের নবী ও রাসূল, এক তোমাদের দীন ইসলাম,
এক তোমাদের আল্লাহ্ এবং এক তোমাদের আল কুরআন,
আফসোস হয়, তবুও তোমরা এক নহ সব মুসলমান!

..

তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা, হাজার দল ও হাজার মত,
এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় তার মুক্তিপথ ?
আত্মঘাতী সে তোমাদের নীতি, ছিল তোমাদের আত্মজ্ঞান
তোমরা মারিছ ভাইকে, তাহারা মারিত-রাখিতে
ভায়ের প্রাণ।" – গোলাম মোস্তফা

ভৌগোলিক আঞ্চলিক দেশ ও দেশাত্ববোধ ইসলামী ঐক্যের অন্তরায় নয়। স্ব স্ব দেশের সুমহান স্বাধীনতার আনুগত্য ও দেশপ্রেমিক অবস্থানের পাশাপশি আন্তর্জাতিক ইসলামী ঐক্যের উজ্জীবন বাঞ্ছিত ও সম্ভব। এখানে সাংঘর্ষিক চিন্তার অবকাশ নেই; বরং মৈত্রী ও সংহতির সুযোগ রেখেছে ইসলাম। দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান এক মিলনমেলা ও মিলনমালায় হবে সংহত। 'তুলুয়ে ইসলাম'-এ ইকবাল বলেন :

"মুসলমান-এর অর্থ হলো প্রেম রবে ভাই তার মনে,
বিশ্বজাহান বাঁধবে সে তার ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে,
বর্ণ জাতির বুৎ ভেঙ্গে দাও, শুনাও সবে প্রেম-বাণী
না রহে কেউ ইরান, তুরান, আরব এবং আফগানী।
কে তুরানী, কে আফগানী-কাজ কি তাহার সন্ধানে,
প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে এসো দিগন্তহীন ময়দানে;
বর্ণ জাতির ধূলায় তোমার পাখনা আজি যায় ঢাকি'
উড়ার আগে পাখনা ঝাড়ো হে হারেমের লাল পাখি।"

'তারানা-ই-মিল্লী'তে কবি বলেন :

"চীন আমার, আরব আমার, ভারত আমার নয়কো পর;
জাহান-জোড়া মুসলিম আমি সারাটি জাহানে বেঁধেছি ঘর।"

মুসলিম ঐক্যের কাব্যধারার পাশাপাশি মানবীয় ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান :

"আমার ঘর দিল্লীও নয়, ইস্পাহানও নয়, নয় সমরখন্দ,
আমি খোদাপ্রেমিক দরবেশ–
সারা জাহানই আমার, সকল মানুষই আমার।"

লক্ষ্যণীয়, মুসলিম স্বাদেশিকতা যেমন গোটা পৃথিবীর, তেমনি তার মানবীয় একাত্মতা সর্বজনীন। 'সকল মানুষই আমার'-এ বৈশ্বিক প্রেমবার্তা ও মৈত্রীর উচ্চারণ ইসলামের এবং এ বার্তাই পৌছে দিয়েছেন ইকবাল তাঁর কাব্যে।

'আসরারে খুদী'তে কবি বলেন :

"আমাদের মন আবদ্ধ নয় হিন্দুস্থান, রোম ও শামে
তথা তুরস্ক ও সিরিয়ায়;
আমাদের দেশ ও সীমান্ত ইসলাম ভিন্ন অন্য কিছু নয়।"

উনিশ শতকের শেষ পর্যায় ও বিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত আল্লামা ইকবালের কাব্য-সাহিত্যের রচনাকাল। মুসলিম বিশ্বের অনেক পরাধীন দেশের শৃঙ্খল-মুক্তি ও স্বাধীনতা সেদিনের সংগ্রামী জনগণের স্বপ্ন। তাদের কর্মতৎপরতা সংহত হচ্ছিলো ইসলামী ঐক্যের চিন্তাধারায়। নেতৃবৃন্দ সে লক্ষ্যেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন অব্যাহত প্রচেষ্টা। জামালুদ্দীন আফগানী, মুফতী 'আবদুহু প্রমুখ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব ভূমিকায় মহান লক্ষ্যের দিকে মুসলিম বিশ্বকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। আল্লামা ইকবালের চিন্তা-চেতনায় তাঁদের প্রভাব স্পষ্ট। আফগানী সম্পর্কে ১৯৩২-এ বন্ধু মুহাম্মদ আহসানের কাছে এক পত্রে কবি এভাবে মূল্যায়ন করেন ও শ্রদ্ধা জানান :

"If the Muslim Nation has not declared him a Mujaddid or if he has not claimed that title for himself, that in no way reduces his status in the minds of those who have a proper insight into the matter." –Iqbal Nama

এক্ষেত্রে ইকবালের চিন্তাধারার ঋণ সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ Calcutta Review ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ইং সংখ্যায় বলেন :

" Of the Modern Muslim thinkers, he is indebted most to Zamal-ud-din al Afghani, who flourished in the second half of the nineteenth centuries and tried to drive home into the fallen Muslim world the message of Scientific outlook and Political resurgence."

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তরণ সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল মুহাম্মদ আকবর মুনীরের কাছে পত্রে যে বক্তব্য রাখেন, তা আজকের সংঘাত-ক্ষুব্ধ মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা মুসলিম বিশ্বের মুক্তির দিক-নির্দেশনা এবং তা স্পষ্টতই আফগানীসহ নেতৃবৃন্দের ইসলামী ঐক্যের চিন্তাধারার সার্থক প্রতিফলন :

"If the Muslim nations of the middle East are united, they would be saved; but if they are unable to resolve their differences and frictions, then there is no hope for their rejuvenation." –Iqbal nama

আফগানীর প্যান ইসলামী মতবাদ সম্পর্কে ইকবাল ১৯৩৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন :

"এ প্রসঙ্গ বলা প্রয়োজন, প্যান ইসলামিজম থেকে ইসলামে বিশ্বরাষ্ট্রের মতবাদ সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলাম একটি বিশ্বমুসলিম রাষ্ট্রের অবশ্যই প্রতীক্ষায়, যা গোত্রীয় ভেদাভেদের অনেক উর্দ্ধে হবে, যাতে ব্যক্তিগত ও একনায়কত্ব ভিত্তিক রাজত্ব এবং পুঁজিবাদের কোন সুযোগ থাকবে না। বিশ্বের অভিজ্ঞতাই স্বয়ং এমন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে দেবে। অমুসলিমদের দৃষ্টিতে হয়তো বা এটি একটি স্বপ্ন হতে পারে। কিন্তু, মুসলমানদের জন্য এটা ঈমান।"

সেই ঈমানের বাস্তবতা দেখতে চেয়েছেন ইকবাল। এ ব্যাপারে তাঁর প্রত্যয় জিজ্ঞাসা সংশয়ের উর্দ্ধে। তবে "বিশ্বের অভিজ্ঞতাই স্বয়ং এমন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে দেবে" ..... কবির আশাবাদ নিশ্চয়ই কোন স্থানু, স্থবির, জড় প্রকৃতির সংগ্রামবিমুখ জাতির জন্য নয়। এখানে 'বিশ্বের

অভিজ্ঞতা'কে আমরা লক্ষ্যে পৌছানোর পথে সহায়ক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

মানব-মস্তিস্ক প্রসূত চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা ও মানুষের কল্যাণে এর চূড়ান্ত ব্যর্থতা সম্পর্কে ইকবাল নিসংশয় ছিলেন। পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিকতা গণতান্ত্রিক আবরণে চাকচিক্যময় হলেও ক্ষয়িষ্ণু; সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে আত্মিক অবদমন ও আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় অপারগতার কারণে সম্ভাব্য বিপর্যয় সম্পর্কে ইকবাল নিশ্চিত ছিলেন। মানবকল্যাণে আর্থ-সামাজিক এ মতবাদগুলোর কখনো কখনো আপাত কল্যাণধর্মিতা দৃশ্যমান সত্বেও চূড়ান্ত ব্যর্থতা সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে সে কথা বলেছেন এবং ইসলামী কল্যাণ-রাষ্ট্রের সম্ভাবনা ও সাফল্য সম্পর্কে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর না হলে দেশে দেশে আঞ্চলিক শ্রেণি সমন্বিত মৈত্রী, সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এর ফলে ইসলামী ঐক্য এবং বৃহত্তর ও চূড়ান্ত পর্যায়ে মানব জাতির ঐক্যের সম্ভাবনাও স্বাভাবিকভাবে ম্লান হবে। মুসলিম ঐক্যের লক্ষ্যে দেশে দেশে গণঐক্যের প্রয়োজনে যেমন ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন প্রয়োজন, তেমনি ইসলামী ঐক্যের অন্যান্য অন্তরায় চিহ্নিত করে তা মুকাবেলায় সচেষ্ট হতে হবে আমাদের তাত্ত্বিক, গবেষক, লেখক, বক্তা তথা সামগ্রিক নেতৃত্বকে।

ইকবালের সাহিত্য সৃষ্টির কাল থেকে মুসলিম বিশ্বের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বহু দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিশ্বের সকল মুসলিম শাসিত দেশে এবং মুসলিম সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অমুসলিম নেতৃত্বের দেশগুলোয় ইসলামী ঐক্যের লক্ষ্যে জনগণ সংহত হচ্ছে। কিন্তু কিছু মুসলিম দেশের পক্ষ থেকে প্রকৃত অর্থে সহযোগিতা না থাকায় সংহতি ও ঐক্য প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে। নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী বিভেদ-হানাহানির সুযোগে আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জনপদ আজো বিপর্যস্ত! তাদের প্রতি সহমর্মিতা, সহযোগিতা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। তবে বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষের সহমর্মিতাও মুসলিম সহ জাতি-ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নির্যাতিত মানুষের প্রাপ্য।

ইকবাল-উত্তরকালে দেশে দেশে স্বাধীনতার তাৎপর্যবহ সুফল প্রাপ্তি ও ইসলামী ঐক্য বাস্তবায়ন ঘটেনি। যুগান্তকারী ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ইসলামী গণসংহতির প্রয়োজন। এজন্য চাই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ত্যাগী ইসলামী নেতৃত্ব–আদর্শের অগ্রপথিক ব্যক্তিত্ববৃন্দ। যোগ্য নেতৃত্ব দেশে দেশে দিক-নির্দেশনা দিয়ে জনগণকে সুসংগঠিত করতে পারলে ইসলামী ঐক্যের পথ প্রশস্ত হবে এবং চূড়ান্তভাবে মানব সংহতির লক্ষ্যে ভিত্তিস্বরূপ ইসলামী ঐক্য গড়ে উঠবে। মানব জাতির মৈত্রী, সংহতি ও ঐক্য বিশ্বাসীদের জন্য মহাকবি মুহাম্মদ ইকবালের স্বপ্নের ইসলামী ঐক্য বিচ্যুতি ভিত্তিক মানব মস্তিস্কপ্রসূত মতবাদের বহুমুখী ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে তাদের জন্য নিয়ে আসবে স্রষ্টার চির উজ্জ্বল শাশ্বত কল্যাণমূলক বিধান ও প্রাগ্রসর সর্বজনীন জীবন-ব্যবস্থা।

সমকালীন ইরানী সাহিত্যের কবি মালিকুশ্ শু'আরা বাহার ইকবাল সম্পর্কে বলেন :

"বর্তমান যুগ এককভাবে ইকবালের যুগ,
তিনি একজন, তবে ছাড়িয়ে গেছেন লক্ষ অযুত!"

আল্লামা আলী আকবর দেহখোদার মূল্যায়নে "ইকবাল প্রাচ্যের মনীষা।"

আল্লামা ইকবালের 'জওয়াবে শিকওয়া'য় আশ্বাস-বাণী :

"যদি তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর আনুগত্য কর,
আমি তোমাদেরই থাকবো,
..
বিশ্বের ভাগ্যলিপিও তোমরাই লিখবে।"

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজে আদেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস কর।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৩)

[ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের 'কালচারাল কাউন্সিলরের দফতর' এবং আল্লামা ইকবাল রিসার্চ একাডেমি'–এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় ১ নভেম্বর -২০০০-এ অনুষ্ঠিত সেমিনারে এ প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ 'ইসলামী ঐক্য' পাঠ করেছিলাম; তা এখানে খানিকটা পরিমার্জিত রূপে। প্রথমাংশ 'খুদী' সাম্প্রতিক সংযোজন]

গবেষক, কবি, সাংবাদিক আবদুল মুকীত চৌধুরী
[রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলি]

কাব্যগ্রন্থ: ১. ভাষ্য মানবিক (বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০১), ২. বাগধারায় বর্ণমালা বর্ণমালা বাগধারায় [একে দুই] কালান্তর প্রকাশনী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৭। ৩. বর্ণমালায় বাগধারা প্রবাদ প্রবচন কাব্য [একে দুই], কালান্তর প্রকাশনী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭। ৪. বিশ্বনবী (সা.) ও উম্মাহ্, লতিফিয়া ফাউন্ডেশন, ১৯/এ নয়াপল্টন, ঢাকা, ১০ মুহররম (আশুরা) ১৪৩৯, ১৬ আশ্বিন ১৪২৫, ১ অক্টোবর ২০১৭। ৫. আল আসমাউল হুসনা ও আসমাউন নবী [আল্লাহ্ জাল্লা শানহু ও বিশ্বনবী (সা.)] নাম কাব্য, লতিফিয়া ফাউন্ডেশন, ৩৮, রোড-১, ব্লক-ই, বনশ্রী, ঢাকা। রবিউল আউয়াল ১৪৪১, অগ্রহায়ণ ১৪২৬, নভেম্বর ২০১৯। ৬. মহানবী (সা.) ও উজ্জীবন, পাতা প্রকাশনী, ২১৭, ভূঁইয়া টাওয়ার, ফকিরেরপুল, ঢাকা, ১৭ শ্রাবণ ১৪২৭, ১০ যিলহজ্জ (ঈদুল আযহা) ১৪৪১, ১ আগস্ট ২০২০।

কাব্যানুবাদ : ৭. দীওয়ান-ই-আলী (রা.) প্রথম খন্ড (ভাষান্তর : মুহাম্মদ হাসান রহমতী, সম্পাদনা : ফজলুর রহমান), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

গবেষণাগ্রন্থ : ৮. Islamic Occasions : Rituals, spirit and message (ই,ফা, জুন ২০১০)।

নজরুল প্রসঙ্গ : ৯. বাংলাদেশে নজরুল : বিদায়ী সালাম (ই ফা বা, ২৬ মে ১৯৮২)।

নজরুল সাহিত্য ও নজরুল সম্পর্কিত সম্পাদনা : ১০. নজরুল ইসলাম : ইসলামী গান (ই ফা বা, ২৫ মে ১৯৮০)। ১১. নজরুল ইসলাম : ইসলামী কবিতা (ই ফা বা, ২৬ মার্চ ১৯৮২)। ১২. জাগরণ : কাজী নজরুল ইসলাম (ই ফা বা, ২৯ আগস্ট ১৯৮০)। ১৩. চিরঞ্জীব : কাজী নজরুল ইসলাম (ই ফা বা, ২৬ মার্চ ১৯৮২)। ১৪. প্রত্যাশা (সাক্ষাৎকার ভিত্তিক জাতীয় কবি প্রাসঙ্গিক সংকলন, সম্পাদনা), (বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ২৫ নভেম্বর ১৯৯৭)।

ভ্রমণকাহিনী : ১৫ আশুরা সংস্কৃতির লালনভূমিতে (ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, জুন ১৯৯৭)।

শিশু-কিশোর সাহিত্য : ১৬. ছড়ায় সচিত্র আরবী হরফ (ই.ফা বা, মার্চ ১৯৮০)। ১৭. সুলতান গিয়াস উদ্দীন (সচিত্র) (ই ফা বা, জুলাই ১৯৮৫)। ১৮. আমরা শিখি বাংলা (যৌথ রচনা : মো: সিরাজুল হক চৌধুরী, আবদুল মুকীত চৌধুরী, নুরুল ইসলাম মানিক। সম্পাদনা : সম্পাদকমন্ডলী), (মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, ই ফা বা, জানুয়ারী ১৯৯৬)। ১৯. Brilliant Active English (Nursery), সহ-লেখক : মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান, ছড়ায় ইংরেজী বর্ণ পরিচিতি, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬)। ২০. ফুলকুঁড়িদের বাংলা [প্রথম ভাগ] (সম্পাদনা), লেখক : হাফিজুর রহমান), (শিশু শ্রেণী, নার্সারীর জন্য, শতদল প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৯৭)। ২১. কথাকলি [তৃতীয় ভাগ], ড. কাজী দীন মুহম্মদের সহযোগী : রচনা ও সম্পাদনা, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারী ১৯৯৪। ২২. আলোর ভুবন (কিশোর কাব্য, পরওয়ানা পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২ আগস্ট ২০১১)। ২৩. ভালবাসার বাংলাদেশ (কিশোর কাব্য, ই.ফা, জানুয়ারি ২০১২)। ২৪. বাগধারায় বর্ণমালার ছড়া (শিশু-কিশোর) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা-চট্টগ্রাম, একুশে বইমেলা ২০১৫, বাংলা ১৪২১। ২৫. পারিবারিক কবিতা ও ছড়া, পাতা প্রকাশনী, ৯৬, আরামবাগ, ২য় তলা, ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮/২ পৌষ ১৪২৫।

অনুবাদ সম্পাদনা

২৬. নাহযুল বালাগাহ্ পরিচিতি (মূল : ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মাহদী জা'ফরী, অনুবাদ : মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী), আল হুদা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৬। ২৭. চিরভাস্বর মহানবী (সা.) দ্বিতীয় খন্ড (মূল : আয়াতুল্লাহ্ জাফর সুবহানী, অনুবাদ : মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান), আল হুদা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৬। ২৮. Bond of Roots (মূল : শিকড়ের বন্ধন/মাহমুদা দেওয়ান)। অনুবাদ : আনিস ফাতেমা, পাতা প্রকাশনী, ২১৭, ভূঁইয়া টাওয়ার, ফকিরেরপুল, ঢাকা, অমর একুশে বইমেলা ২০২০, মাঘ ১৮, ১৪২৬। ২৯. Poems hidden in Heart (মূল : অন্তরের অন্তরালের পঙক্তিমালা/ মাহমুদা দেওয়ান)। অনুবাদ : আনিস ফাতেমা, পাতা প্রকাশনী, ২১৭, ভূঁইয়া টাওয়ার, ফকিরেরপুল, ঢাকা, অমর একুশে বইমেলা ২০২০, মাঘ ১৮, ১৪২৬।

নামাযে মনোযোগী হওয়ার গুরুত্ব ও করণীয়

মাওলানা আ.ন.ম কুতুবুজ্জামান

নামাযে মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ– الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

-ঐ সকল মুমিন সফলকাম, যারা ভীতি সহকারে বিনীতভাবে নামায আদায় করে। (সূরা মুমিনূন, আয়াত: ১-২)

নামাযে অমনোযোগিতা বা অন্যমনস্ক হওয়া শয়তানের কুমন্ত্রণার অন্তর্গত বিষয়। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে নিম্নোল্লিখিত হাদীসে এসেছে-

عن مسروق قال: قالت عائشة: رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم

-হযরত মাসরুক (র.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নামাযে কোনো লোকের এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ইহা শয়তানের ঐ কৌশলগত চুরির অন্তর্গত বিষয়, যা তোমাদের কারো নামাযে সে করে থাকে। (সহীহ বুখারী, পরিচ্ছেদ- الالتفات في الصلاة)

হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه

-রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করল অতঃপর দুই রাকআত নামায এমনভাবে আদায় করল যার মধ্যে তার মনকে দিক ভ্রান্ত করল না, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (সহীহ বুখারী, পরিচ্ছেদ- الوضوء ثلاثا ثلاثا)

মোটকথা, একাগ্রতা ও বিনয় সহকারে নামায আদায়কারী মুমিনগণকে সফলকাম বলার মাধ্যমে নামাযে একাগ্রতার অপরিসীম গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

আয়াতে বর্ণিত খুশু (বিনয়) এর ব্যাখ্যায় মনীষীগণের বিভিন্ন উক্তি ও অভিমত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর মতানুযায়ী ভীত ও হীন অবস্থার নাম খুশু। হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ (র.) এর মতে ভয় সহকারে। মুকাতিল (র.) এর মতে বিনীত অবস্থার নাম। ইমাম মুজাহিদ (র.) এর মতে চক্ষু অবনত করা ও আওয়াজ নিচু করা। যা খুদ্বূ এর সমার্থবোধক। তবে পার্থক্য হচ্ছে খুদ্বূ শারীরিকভাবে অবনত হওয়াকে বুঝায় আর খুশু অন্তর, চক্ষু ও আওয়াজের বিনয়কে বুঝায়। হযরত আলী (রা.) এর মতে ডান বামে না তাকানো বুঝায়। অনুরূপ হযরত সাঈদ ইবন জুবাইর (র.) এর মতে আল্লাহর ভয়-ভীতির কারণে ডান বা বামের কাউকে না চেনা এমন অবস্থাকে খুশু বলা হয়। (তাফসীরে বাগাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৬)

তাফসীরে বাগাবীতে এসেছে-

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه

-হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বান্দাহ তার নামাযে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যমনস্ক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বান্দাহ অভিমুখী হয়ে থাকেন। অতঃপর বান্দাহ যখন অন্য মনস্ক হয় তখন তার দিক থেকে ফিরে যান। (তাফসীরে বাগাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৮)

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه

-হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন, এর অন্তর বিনীত হলে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিনীত হত। (তাফসীরে বাগাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৮)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন তার নিকট শয়তান আসে এবং তাকে সন্দেহে ফেলে দেয়। অবশেষে সে কত রাকআত নামায পড়েছে সেটুকুও ভুলে যায়। এমন বিপাকে কেউ পড়লে সে শেষ বৈঠকে থাকাবস্থায় যেন দুটি (সাহু) সিজদা করে নেয়।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وقوموا لله قانتين -তোমরা আল্লাহর সামনে বিনীত (অনুগত, মনযোগী) হয়ে দাঁড়াও। (সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৮)

তাছাড়া অমনোযোগী ও উদাসীন অবস্থার নামাযকে মুনাফিক চরিত্রের কার্যকলাপ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন,

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

-আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় নিতান্ত অলসতা নিয়ে দাঁড়ায় যেন মানুষকে দেখাচ্ছে, আর আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। (সূরা নিসা, আয়াত-১৪২)

মহান আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ– الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

-ঐ সকল নামাযীদের জন্য দুর্ভোগ যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর (অমনোযোগী, অসচেতন)। (সূরা মাঊন, আয়াত-৪,৫)

নামাযে মনোযোগী হওয়ার জন্য অনেক করণীয় বিষয়াবলি রয়েছে। যথা: মনকে নামাযের কার্যাবলির উপর নিবদ্ধ রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া। এর জন্য প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শয়তানের ওয়াসওয়াসাহ বা কুমন্ত্রণা। কোনো ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ানোর সাথে সাথে শয়তান তার মনে নানাবিদ বিষয়াদি উপস্থিত করে তার মনকে ভিন্নমুখী করে নামায থেকে সরিয়ে নেয়। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে এসেছে-

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم، إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন তার নিকট শয়তান আসে এবং তাকে সন্দেহে ফেলে দেয়। অবশেষে সে কত রাকআত নামায পড়েছে সেটুকুও ভুলে যায়। এমন বিপাকে কেউ পড়লে সে শেষ বৈঠকে থাকাবস্থায় যেন দুটি (সাহু) সিজদা করে নেয়। (সহীহ মুসলিম, পরিচ্ছেদ: السهو في الصلاة و السجود له)

عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا– قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني– مسلم: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة

-হযরত উসমান ইবন আবুল আস (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে তার নামাযে ও কিরাতে শয়তান কর্তৃক বিভ্রাট সৃষ্টি করার বিষয় উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিকারের পন্থা হিসেবে বললেন, নামাযে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টিকারী শয়তান 'খিনযাব' থেকে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নামাযী ব্যক্তি তার বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করবে। (সহীহ মুসলিম, পরিচ্ছেদ: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة)

এমতাবস্থায় নামাযরত ব্যক্তির করণীয় হচ্ছে, প্রথমত: স্মরণ হওয়া মাত্র নিজের মনকে নামাযের দিকে ফিরিয়ে আনা। আর এমনটা সবসময় হলে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে অন্তরাত্মাকে শয়তানের প্রভাবমুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। যা আল্লাহর যিকর বা স্মরণ দ্বারা অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে কেবল সম্ভব। এজন্য তরীকতপন্থী হক্কানী আউলিয়ায়ে কিরামের সান্নিধ্য অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর যিকরের কার্যকর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে আল্লাহর স্মরণে অভ্যস্ত করা সর্বাধিক উপকারী ও কার্যকর স্থায়ী ব্যবস্থা।

আর এর সাথে আল্লাহর গুণবাচক নামের ধ্যানের (মুরাকাবা, মুশাহাদার) অভ্যাস করা। এতে আল্লাহর স্মরণ আরো অর্থবহ ও সহজতর হয়। হাদীস শরীফে যাকে 'ইহসান' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে-

ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك

-তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, আর দেখতে পারছো এমনটা ভাবতে না পারলে মনে করবে তিনি তোমাকে দেখছেন। (সহীহ বুখারী, পরিচ্ছেদ: বাবু সুআলি জিবরীলান নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর ভয়ে মনকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখা।

তৃতীয়ত: আল্লাহর মহত্ত্ব অনুধাবন করে তার গোলামীর গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং নিজেকে আল্লাহর বিনীত নগণ্য দাস হিসেবে তার সামনে পেশ করার মানসিকতা অর্জন করা।

চতুর্থত: আল্লাহর মহব্বত বাড়ানো। কেননা মনীষীদের অনেকেই দৃঢ়তার সাথে একথা বাস্তব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, من أحب شيئا أكثر ذكره -কোনো ব্যক্তি যে বিষয় ভালোবাসে তার স্মরণ বেশি করে। এজন্য প্রয়োজন আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যথাসাধ্য আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর পছন্দনীয় পথে খরচ করা, সার্বিক ত্যাগে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা ইত্যাদি।

পঞ্চমত: পার্থিব বিষয়াদির প্রতি মহব্বত কমানো এবং এগুলোর চিন্তা কিংবা কল্পনা থেকে মনকে যত বেশি বাঁচানো যাবে, নামাযসহ সকল ইবাদত ততবেশি মনযোগ সহকারে আদায় করা সম্ভবপর হবে।

আরেকটি সাহায্যকারী পদক্ষেপ হচ্ছে, নামাযে পঠিত প্রতিটি বাক্যের অর্থের দিকে মনকে ধরে রাখার চেষ্টা করা। এ জন্য নামাযীকে তার নামাযে পঠিত সকল তাকবীর, তাসবীহ, দুআ, দুরূদ ও সূরা ফাতিহাসহ সংক্ষিপ্ত কয়েকটি সূরার অর্থ শিখে নেয়া।

অর্থের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে ন্যূনতম মুখ দিয়ে পঠিত বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করা এবং সেদিকে খেয়াল নিবদ্ধ রাখা। যেকোনো নামাযী তার নামাযে অন্যমনস্ক হওয়া থেকে নিস্কৃতির প্রতিকারক হিসেবে উপরোক্ত পদ্ধতির অনুসরণে নিস্কৃতি লাভ সম্ভবপর হবে। সর্বোপরি, নামাযসহ সকল ইবাদত মনোযোগিতার সাথে সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাযকিয়ায়ে নফসের (আন্তরিক পরিশুদ্ধিতার) বিকল্প নেই।

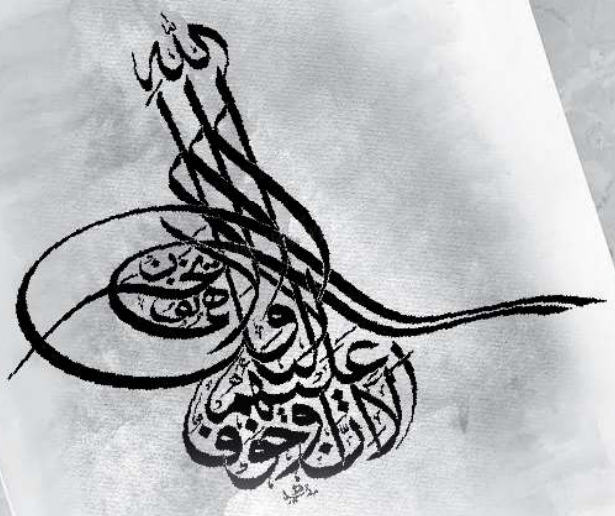

আল্লাহর সাথে আউলিয়ায়ে কিরামের সম্পর্কের স্বরূপ

মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

আল্লাহ তাআলার নিকট তার ওলীগণের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এ কারণে আল্লাহর ওলীদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، (رواه البخاري)

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। ফরয ব্যতীত অধিকতর পছন্দনীয় কোনো বিষয় নেই যার দ্বারা আমার বান্দাহ আমার নৈকট্য অর্জন করবে। আর আমার বান্দাহ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটে আসতে থাকে এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে শুনতে পায়। আমি তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখতে পায়। আমি তার হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলাচল করে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫০২)

ইসলামী শরীআতে ফরয ও নফল যে দুটি পরিভাষা চালু আছে সে দুটি পরিভাষা মূলত: হাদীস থেকেই গৃহীত এবং বর্ণিত হাদীস নফল ইবাদতের গুরুত্ব বুঝানোর ক্ষেত্রে দলীল।

উপরে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) ফাইদুল বারী গ্রন্থে বলেন,

إذا صَحَّ الحديثُ، فَلْيَضَعْهُ على الرأس والعين،

وإذا تعالى شيءٌ منه عن الفهم، فلْيَكِلْهُ إلى أصحابه، وليس سبيلُه يٌّ يُجَرِّحَ فيه. أمَّا علماءُ الشريعة فقالوا: معناه أنَّ جوارحَ العبد تصيرُ تابعةً للمرضاة الإلهية، حتَّى لا تتحرَّك إلَا على ما يرضى به ربُّه. فإذا كانت غايةُ سمعِه وبصرِه وجوارحِه كلِّها هو اللهُ سبحانه، فحينئذٍ صَحَّ أن يقالَ: إنه لا يَسْمَعُ إلَا له، ولا يتكلَّمُ إلَا له، فكأنَّ اللهَ سبحانه صار سمعَه وبصرَه. قلتُ: وهذا عدولٌ عن حقِّ الألفاظ، لأنَّ قولَه: «كنتُ سمعَه»، بصيغة المتكلِّم، يَدُلُّ على أنَّه لم يبق من المتقرِّب بالنوافل إلَا جسدُه وشبحُه، وصار المتصرِّفُ فيه الحضرةَ الإلهيةَ فحسب، وهو الذي عناه الصوفية بالفناء في الله، أي الانسلاخ عن داوي نفسه، حتى لا يكونَ المتصرِّفُ فيه إلَا هو.(فيض الباري)

-আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, যেহেতু হাদীসটি সহীহ সেহেতু একে সর্বান্তকরণে স্থান দেওয়া উচিত। যখন কোনো বিষয় কারো জ্ঞান বুদ্ধির উর্ধ্বে থাকে তখন উচিত হলো বিষয়টিকে জ্ঞানীদের নিকট সোপর্দ করা। নিজেই এটির সমালোচনা শুরু করে দেওয়া উচিত নয়। শরীআতের উলামায়ে কিরাম বলেন, হাদীসের অর্থ হলো বান্দাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগামী হয়ে যায়, পরিশেষে এগুলো তাই করে যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। বান্দাহর শ্রবণ, দৃষ্টি ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চূড়ান্ত লক্ষ্য যখন আল্লাহর তাআলার সত্তা হয়ে যায়, তখন একথা বলা সঠিক হবে যে, বান্দাহ শুনলে আল্লাহর জন্য শুনে এবং দেখলে আল্লাহর জন্য দেখে। আল্লাহ যেন সেই বান্দাহর কান ও চক্ষু হয়ে যান। আমি বলি (আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী) এই অর্থ হাদীসের প্রকৃত অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং ভাষা থেকে বিচ্যুত। হাদীসে كنت سمعه মুতাকাল্লিম বা উত্তম পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে যা জ্ঞাপন করে, যে ব্যক্তি নফল ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে তার দেহ ও আকৃতি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আর তার মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগকারী আল্লাহ তাআলাই হয়ে যান। এ স্তরটিকেই সূফীগণ 'ফানাফিল্লাহ' বলে থাকেন। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কামনা বাসনার আওতার বাইরে চলে যান এবং তার মধ্যে কেবল আল্লাহর তাসাররুফ বা ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে যায়। (ফাইদুল বারী)

মোটকথা হলো, বান্দাহর এই ধরনের অবস্থানে পৌঁছার যে মাধ্যম তা হলো, আধ্যাত্মিক ইবাদত।

মাওলানা রূমী (র.) মসনবীতে অতি সুন্দর করে আল্লাহর সাথে আল্লাহর ওলীদের সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরেছেন,

مطلق آں آواز خود از شہ بود
মুতলাক আঁ আওয়াযে খোদ আয শাহ্ বুওয়াদ
گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
গারচে আয হলকুমে আবদুল্লাহ বুওয়াদ

অর্থ: ঐ ধ্বনি আল্লাহ পাকেরই আওয়াজ যদিও তা আল্লাহর বান্দাহর (ওলীয়ে কামিল এর) কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

گفت او را من زبان و چشم تو
গুফতে উরা মান যবানো চশমে তূ
من حواس و من رضا و خشم تو
মান হাওয়াস ও মান রেযা ও খাশমে তূ

অর্থ: আল্লাহ তাআলা (তার ওলীকে) বলেন, আমিই তোমার রসনা ও চক্ষু। আমিই তোমার ইন্দ্রিয়, তোমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি।

روکہ بی یسمع وبی یبصر توئی
রাউ কে বী ইয়াসমাউ ওয়া বী ইউবসিরু তূয়ী
سر توئی چہ جائے صاحب سر توئی
সিররে তুয়ী ছে জায়ে সাহিবে সিররে তুয়ী

অর্থ: যাও (হে প্রিয়!) তুমি আমার দ্বারা শ্রবণ করো, আমার দ্বারা প্রত্যক্ষ করো। তুমি আমার গুপ্ত রহস্য ভাণ্ডার; বরং তুমি নিজেই আমার রহস্য।

چوں شدی من کان للہ از وبہ
চুঁ শুদী মান কানা লিল্লাহি আয ওলাহ্
من ترا باشم کہ کان اللہ لہ
মান তোরা বাশাম কে কানাল্লাহু লাহ

অর্থ: যখন তুমি (ইশকে ইলাহীর বদৌলতে) আল্লাহর জন্য হয়ে গেলে তখন আমিও তোমার বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে গেলাম।

উল্লেখ্য যে, ওলী-আল্লাহগণের বিভিন্ন বিষয়কে অন্যান্যদের সাথে তুলনা করা বেআদবী। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী (র.) বলেন,

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر
কার পাকাঁরা কিয়াসায খোদ মগীর
گرچہ ماند در نویشتن شیر و شیر
গরচে মানাদ দর নাবেশতান শের ও শীর

অর্থ: প্রিয় বৎস! পাক লোকদের কার্যকলাপকে নিজের কাজের সাথে তুলনা করো না। কেননা, 'শের' ও 'শীর' দুই শব্দের রূপ এক হলেও অর্থ এক রকম নয়। 'শের' অর্থ বাঘ আর 'শীর' অর্থ দুধ।

شیر آں باشد کہ مرد او را خورد
'শীর' আঁ বাশাদ কে মরদ উ রা খোরাদ
شیر آں باشد کہ مردم را درد
'শের' আঁ বাশাদ কে মরদম রা দারাদ

অর্থ: 'শীর' এমন পদার্থ যা মানুষে খায়, আর 'শের' এমন প্রাণী যা মানুষকে চিড়ে-ফেড়ে ভক্ষণ করে।

جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد
জুমলা আলম যীঁ সবব গোমরাহ শুদ
کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد
কাম কাসে যাবদালে হক আগাহ শুদ

অর্থ: অধিকাংশ লোক এজন্য পথভ্রষ্ট হয়েছে যে, তারা ওলী-আল্লাহর অবস্থা অবগত নন।

اشقیا را دیدۂ بینا نہ بود
আশকিয়ারা দীদায়ে বীনা না বুদ
نیک وبد در دیدہ شاں یکساں نمود
নেক ও বদ দার দীদাশাঁ একসাঁ নমুদ

অর্থ: এ হতভাগারা সত্যদর্শী হতে বঞ্চিত ছিল, কাজেই তাদের চোখে নেককার ও বদকার একই রকম মনে হতো।

ہمسری با انبیا برداشتند
হামসরী বা আম্বিয়া বর দাশতান্দ
اولیا را ہم چوں خود پنداشتند
আউলিয়ারা হামচুঁ খোদ পেন্দাশতান্দ

অর্থ: (সুতরাং) তারা নিজেদের ভুল খেয়ালের দ্বারা কখনও নিজেদেরকে আম্বিয়ায়ে কিরামের মত দাবী করে বসে, আবার (কোন সময়) আল্লাহর ওলীদের নিজেদের সমান মনে করে থাকে।

বাহ্যদর্শী আলিমগণও ইলম অর্জন করেন এবং সূফীগণও ইলম অর্জন করেন। কিন্তু দু'জনের ইলমের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। যেমন মাওলানা রূমী (র.) বলেন-

ہر دو یک گل خورد زنبور و نحل
হার দো এক গুল খোরদ যম্বুর ও নহল
لیک زیں شد نیش و زاں دیگر عسل
লেকে যীঁ শুদ নেশো যাঁ দিগার আসল

অর্থ: বোলতা ও মৌমাছি উভয়ে একই ফুলের রস আহরণ করে থাকে। কিন্তু একটিতে উৎপন্ন হয় মধু ও অন্যটিতে উৎপন্ন হয় হুল।

ہر دو گوں آھو گیا خورند و آب
হারদো গোঁ আহু গিয়া খোরদন্দো ও আব
زیں یکے سرگیں شد و زاں مشک ناب
যীঁ একে সরগীঁ শোদো যাঁ মুশকেনাব

অর্থ: উভয় প্রকারের হরিণই ঘাস খায়। একটির মধ্যে শুধু গোবর তৈরী হয়, আর অন্যটির নাভি থেকে খাটি মেশক তৈরি হয়।

ফুতুহুল গাইব

মূলঃ গাউসুল আযম আব্দুল কাদির জিলানী (র.)

অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ যোবায়ের

[ফুতুহুল গাইব শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর ৮০টি বক্তব্যের সংকলন। এগুলোর বিষয়বস্তু আল্লাহপ্রাপ্তির উপায়, পার্থিব জীবনের হাকীকত, শরীআত অনুযায়ী জীবনযাপনের গুরুত্ব, আল্লাহর ফয়সালায় আত্মসমর্পণ করা, তাওয়াক্কুল, খাওফ, রিদার মর্মার্থ, নফস ও প্রবৃত্তির মোকাবিলাসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত। তাঁর পুত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি যে ওসীয়ত করেছিলেন, তাও এতে স্থান পেয়েছে। এ বইটি কায়রোর মুসতাফা আল বাবি আল হালবী থেকে ১৩৯২ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।]

বইয়ের বাচনভঙ্গিতে বোঝা যায়, এটি তাঁর কোন ছাত্রের সংকলন। কালাইদুল জাওয়াহির প্রণেতার মতে, শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর একজন মুরীদ শাইখ যাইনুদ্দীন মারসফী আস সাইয়াদ এ গ্রন্থটির মূল সংকলক। এজন্য বইটি খুললেই প্রতিটি আলোচনার শুরুতে 'শাইখ (র.) মাদরাসায় বলেছেন অথবা খানকায় বলেছেন...' বাক্যটি পাওয়া যায়।

*আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদীর মতে, সাড়ে তিনশ বছর আগেও উপমহাদেশে এ বইটির তেমন চর্চা ছিল না। শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) মক্কায় হজ্জ করতে গিয়ে শাইখ আলী মুত্তাকীর কাছে বইটি দেখতে পান। এরপর তিনি একটি কপি সাথে করে নিয়ে আসেন। উপমহাদেশে আসলে তখন থেকেই অত্যন্ত উপকারী এ গ্রন্থটি বিপুল জনপ্রিয়। বইয়ের ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি শাইখের একটি বক্তব্য আমরা তুলে ধরছি।- **অনুবাদক]***

পরিচ্ছেদ-১: আল্লাহর নির্দেশ পালন ও সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা প্রসঙ্গে

একজন মুমিনকে সর্বাবস্থায় অবশ্যই তিনটি বিষয়ের মধ্যে থাকতে হবে:

- সে কোন আদেশ অনুসরণ করবে
- কোন নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকবে এবং
- আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকবে।

সর্বনিম্ন অবস্থাতেও মুমিনের মধ্যে এগুলোর একটি না একটি থাকবে। তাই মুমিনের কর্তব্য এগুলোকে হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখা, নিজের সাথে এগুলো নিয়ে কথা বলা এবং নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে এসবে সর্বাবস্থায় নিয়োজিত রাখা।"[১]

পরিচ্ছেদ-২: একে অপরকে সদুপদেশ দেওয়া প্রসঙ্গে

[রাসূলুল্লাহ ﷺ এর] অনুসরণ করো, বিদআতী হইও না; আনুগত্য করো, ধর্মচ্যুত হইও না; তাওহীদবাদী হও, শিরক করো না; [শিরকী ধ্যানধারণা থেকে] আল্লাহকে পবিত্র রাখো, তাঁকে অপবাদ দিও না; সত্যায়ন করো, সন্দেহে পতিত হয়ো না; ধৈর্য ধরো, অস্থির হইও না; দৃঢ়পদ হও, পালিয়ে যেও না; তাঁর কাছে প্রার্থনা করো, বিতৃষ্ণ হইও না; অপেক্ষা করো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করো, হতাশ হইও না; নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখো, শত্রুতাপূর্ণ হইও না; [আল্লাহর] আনুগত্যে একত্রিত হও, বিভক্ত হয়ে যেও না; পরস্পরকে ভালোবাসো, ঘৃণা করো না; সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র থাকো, সেসবে কলুষিত আর মিশ্রিত হইও না; বরং তোমাদের রবের আনুগত্যে নিজেদেরকে ভূষিত করো। তোমাদের মাওলার দরজা থেকে ফিরে যেও না; তাঁর অভিমুখী হওয়া থেকে মুখ ফিরিও না; তাওবা করতে গড়িমসি করো না; গভীর রাতে এবং দিনের প্রান্তগুলোতে[২] তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা চাইতে ঢিলেমি করো না। [এগুলো করলে] হয়তো তোমরা রহমত আর সৌভাগ্য লাভ করবে, জাহান্নাম থেকে তোমাদের দূরে রাখা হবে, জান্নাতে আনন্দিত হবে, আল্লাহর কাছে পৌঁছবে, নিআমতরাজি আর কুমারীদের সাহচর্যে ব্যস্ত থাকবে আর এগুলো সবই তোমাদের হবে চিরকালের জন্য। [এগুলো করলে হয়তো] সর্বোত্তম ঘোড়ায় চড়বে, আনতনয়না হুর, নানা ধরনের সুগন্ধি, গায়িকাদের কণ্ঠধ্বনি আর অন্যান্য নিআমতে আনন্দ করবে এবং নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহদের সাথে তোমাকেও [জান্নাতের উচ্চস্থানে] উঠানো হবে।

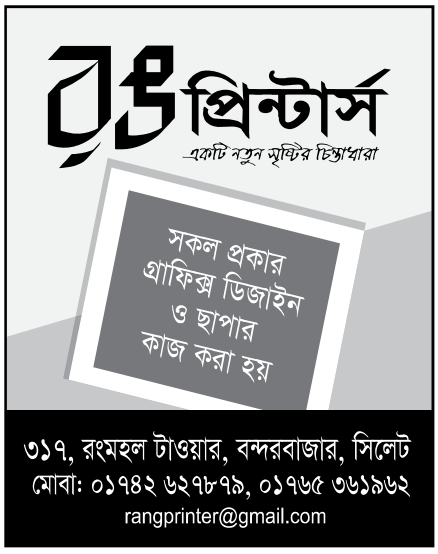

[১]. এ কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক ও গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয়। বান্দার জন্য যা প্রয়োজনীয়, এখানে তাই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তেমন সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত-৯০) "তোমরা যদি ধৈর্যশীল ও মুত্তাকী হও, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১২০) আদিষ্ট বিষয় পালন করা এবং গর্হিত বিষয় তাগ করা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ ভাগ্যলিপিতে ধৈর্যধারণও সবরের অন্তর্গত। এজন্য ইবন তাইমিয়া বলেছেন, 'অতএব শাইখ আব্দুল কাদিরের তিনটি বিষয় এই মূলনীতিদ্বয় অর্থাৎ তাকওয়া ও সবরের অভিমুখী। আবার উল্লিখিত তিনটি বিষয়ই প্রকৃতপক্ষে আদেশ পালন অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত।

[২]. ফজর ও মাগরিবের সময়।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.)
সারহিন্দের উজ্জ্বল প্রদীপ

মারজান আহমদ চৌধুরী

সম্রাট আকবর এটি প্রায়ই ভাবতেন, হিন্দুস্তানের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে আন্তঃধর্মীয় বিভেদ। এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ঈসায়ী সবাই একে অন্যের সাথে লড়তে ব্যস্ত। আর এটি অর্থনৈতিক উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। আকবরের সভাসদ ফৈজি ও আবুল ফযল এবং রাজদরবারের আরও কতিপয় শিয়া ও হিন্দু সভাসদ তাকে এ সমস্যা থেকে নিরসন পাওয়ার জন্য পরামর্শ দিল। বলল, মহারাজ, মূল সমস্যা ধর্মবিশ্বাসে নয়। মূল সমস্যা হচ্ছে শরীআহ। খোদাকে তো সবাই মানে, যে নামেই মানুক। কিন্তু শরীআহ (দ্বীনি নিয়মনীতি ও বিধিনিষেধ) পালন করতে গিয়েই যত বিভেদ তৈরি হয়। যেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীআতের এক হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে (তখন ৯৯০ হিজরী চলছিল), তাই এটি এখন রহিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের জন্য প্রয়োজন নতুন এক ধর্ম। তাদের পরামর্শে সম্রাট আকবর সব ধর্মকে একত্রিত করে দ্বীন-এ-ইলাহি নামক নতুন এক ধর্ম তৈরি করলেন। সে ধর্মে কোনো শরীআহ ছিল না। কেবল খোদাকে বিশ্বাস করতে হতো, যে নামেই হোক। আকবরকে ডাকা হতো যিল্লুল্লাহ বা আল্লাহর ছায়া। তাকে সিজদাহ করা হতো। আকবর নিজেও প্রতিদিন সূর্য-নমস্কার করতেন। নতুন ধর্মের আগমনের সাথে সাথে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভসহ যাবতীয় রীতিনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

সে সময় সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) নামক একটি 'তত্ত্ব' বেশ জনপ্রিয় ছিল। সর্বেশ্বরবাদ মানে সবকিছুর মধ্যে খোদা বিদ্যমান। মানুষের মধ্যে, পশুর মধ্যে, বৃক্ষলতার মধ্যে। তাই আলাদা করে আল্লাহর ইবাদত করার চাইতে মানুষ সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে খুঁজতে শুরু করেছিল। এই শিরকি তত্ত্বটি দ্বীন-এ-ইলাহিকে তাত্ত্বিকভাবে প্রচুর শক্তির যোগান দিচ্ছিল। বিশিষ্ট আলিম-উলামা কয়েকদিন প্রতিবাদ করেছিলেন সত্য। তবে এক সময় নির্যাতনের মুখে থেমে গিয়েছিলেন। আকবর মারা যাওয়ার পর ক্ষমতায় বসেন তার পুত্র জাহাঙ্গীর।

আকবরের শাসনকালে পাঞ্জাবের সারহিন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন আহমদ নামের এক শিশু। তাঁর রক্তে বইছিল সায়্যিদুনা উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহু'র উষ্ণতা। পিতা শাইখ আবদুল আহাদ ফারুকীর কাছে পবিত্র কুরআন হিফয করে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এরপর তৎকালীন বিখ্যাত শিয়ালকোট মাদরাসা থেকে হাদীস, তাফসীর, সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। শাইখ কামালুদ্দীন, শাইখ ইয়াকুব কাশ্মীরি ও হারামাইনের মুহাদ্দিসদের কাছে তিনি হাদীস পড়েছেন। সাহিত্যে পারদর্শিতার কারণে যৌবনে দরবারি পণ্ডিতদের সাথে তাঁর সখ্যতা ছিল। পরে তাদের ভ্রান্ততা দেখে নিজেকে সরিয়ে আনেন। সম্রাট আকবরের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, বাদশাহ বেদ্বীনাস্ত (এই বাদশাহ বেদ্বীন)। আকবরকে এতবড় কথা বলার সাহস তখন অন্য কারও ছিল না।

শাইখ আহমদ নিয়মিত হাদীস ও তাফসীরের দারস শুরু করেন। এরপর নিজেকে রূহানীভাবে দৃঢ়তর করা ও ইলমে তাসাউফ অর্জনের লক্ষ্যে তিনি শাইখ খাযা বাক্বী বিল্লাহ (র.) এর দ্বারস্থ হন। খাযা বাক্বী বিল্লাহ (র.) এর হাত ধরে শাইখ আহমদ সারহিন্দী তাসাউফের السلسلة النقشبندية للطريقة الذهبية তথা নকশবন্দী সোনালি ধারার সাথে নিজেকে যুক্ত করে নেন,

যে সিলসিলা আহলে বাইতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খলীফা শাইখ মুহাম্মদ মাসুম নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া নামে এই সিলসিলা সামনে এগিয়ে নিয়েছেন।

আকবরের শাসনামলে শাইখ আহমদ সারহিন্দী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাক্কী জীবনের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ ধৈর্যের সাথে অবিরত দ্বীনি দাওয়াত দেওয়া এবং বাধাবিপত্তিকে আপাতত পাশ কাটিয়ে যাওয়া। অনেকটা নীরবে, নাগালের ভেতরেই দ্বীন প্রচার করতেন শাইখ আহমদ। যার সাথে সাক্ষাত হতো, যাকেই পত্র লিখতেন, প্রয়োজনীয় কথা বলার পর একটি হাদীস লিখে দিতেন এবং এর ওপর আমল করতে বলতেন। যেখানে বিদআত দেখতেন, সেখানে এর বিপরীত সুন্নাতের ওপর আমল শুরু করতেন। মূর্খদের সাথে তর্কে যেতেন না। নিজেকে সুন্নাতের প্রতি এমনভাবে সঁপে দিতেন যে, মানুষ তাঁকে দেখে দেখে সুন্নাহ শিখে নিত। তবে জাহাঙ্গীর ক্ষমতায় বসার পরই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাদানী জীবনের আদর্শ অনুসরণে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। অর্থাৎ প্রকাশ্যে, বাতিলের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হয়ে। শরীআতের আবশ্যকীয়তা ও দ্বীন-এ-ইলাহির ভ্রান্ততা প্রকাশ করে তিনি পত্র লিখতে শুরু করলেন। রাজ্যের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নেই, যার কাছে তিনি পত্র লেখেননি। তাঁর মাতৃভাষা ফার্সি ছাড়াও আরবী ও তুর্কী ভাষায় পত্র লিখে এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম রাজ্যে প্রেরণ করতেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল, আকবরের যুগে ইসলামের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার বিলুপ্তি ঘটানো। তাঁর পত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর, তার স্বার্থান্বেষী সভাসদ ও দুনিয়ালোভী মৌলভীদের মাথায় বজ্রপাতের মতো পতিত হতে শুরু করল। মানুষকে দ্বীনে ফিরিয়ে আনতে তিনি প্রকাশ্যে কাজ শুরু করলেন। ওয়ায নসীহত তিনি করতেন; তবে দ্বীনি ও সামাজিক সংস্কারে তাঁর ক্ষুরধার লিখনি এবং নিজ জীবনে সুন্নাতের প্রতি যত্নশীলতা এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছিল। বলা যায়, বাহাস-মুনাযারায় না গিয়ে শক্তিশালী লিখনির মাধ্যমে শাইখ আহমদ এ পাহাড় ডিঙ্গিয়েছেন। তাঁর মাকতুবাত আজও দ্বীনি হিকমাতের খাযানা হয়ে আছে।

সে সময় সবচেয়ে বড় বড় যে সব গোমরাহি এসেছিল, তা মূলত শিয়া ও মূর্খ-ভণ্ড সুফীদের দ্বারাই এসেছিল। শাইখ আহমদ অকপটে বলেছেন, মূর্খ সুফীরা শয়তানের ভাঁড়। শিয়াদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, সাহাবা-বিদ্বেষীরা (শিয়া) সবচেয়ে বড় বিদআতি এবং দ্বীনকে বিকৃতিকারী। তাযকিয়া-বিহীন বাহাস-মুনাযারায় লিপ্ত মৌলভীদের মধ্যে রূহানিয়াতের অভাবকেও তিনি তাঁর বক্তৃতা ও লিখনিতে তুলে ধরেছেন। শাইখ আহমদ তাঁর লিখনিতে সর্বেশ্বরবাদ, শিরক, বিদআত ও শিয়াদের তুলোধোনা করেছেন। ইলমে তাসাউফকে তিনি পুনরায় দাঁড় করিয়েছেন সুন্নাতের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর, যেভাবে করেছিলেন তাঁর পূর্বসূরি ইমাম সায়্যিদ আবদুল কাদির জিলানী (র.) ও ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী (র.)।

শাইখ আহমদ শুরুতেই দ্বীন-এ-ইলাহিকে আঘাত করেননি। বরং এর পেছনে থাকা শক্তি অর্থাৎ শিয়া তাত্ত্বিক, মূর্খ সুফী, দুনিয়ালোভী মৌলভী ও সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসীদের ওপর কুঠার মেরেছিলেন। তিনি জানতেন, আকবর বা জাহাঙ্গীরের চেয়ে বড় ক্ষতিকর তাদেরকে পরামর্শদাতারা। তাঁর তাজদীদি কাজের প্রভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র তখন কাঁপছিল।
এক সময় তাঁর ডাক আসে রাজদরবার থেকে। তিনি গিয়ে দেখেন, দরবারের দরজা নিচু করে বানানো হয়েছে। শাইখ আহমদ বুঝতে পারলেন, জাহাঙ্গীরের সামনে তাঁর মাথাকে ঝুঁকানোর জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি সেই দরজার ভেতর প্রথমে পা ঢুকালেন, এরপর দেহ এবং সবশেষে মাথা। শাইখ আহমদকে ঝুঁকানোর স্বপ্ন যারা দেখেছিলেন, তারা ততক্ষণে নিজেদের ব্যর্থতা বুঝে গিয়েছিলেন। দরবারে প্রবেশ করে তিনি আমির-উমারা, শিয়া তাত্ত্বিক ও দুনিয়ালোভী মৌলভীদের সামনে তিনি তাদের ভ্রান্ততা ও অসারতা তুলে ধরতে শুরু করলেন। শাস্তিস্বরূপ তাঁকে মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়রে বন্দী করা হয়। আল্লাহর জন্য কারাবরণ করেছিলেন দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠতম মুজাদ্দিদ।

নিজের জীবদ্দশায় তিন পুত্রকে হারিয়েছেন শাইখ আহমদ সারহিন্দী। নিজেও মাত্র ৬১ বছরের হায়াত পেয়েছিলেন। আর তাতেই হিন্দের মাটিকে তিনি রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রঙে রাঙিয়ে গেছেন। তাঁর হাতেই দ্বীন-এ-ইলাহির বিদায়ঘণ্টা বেজেছে। তাঁর হাতে তাওবাহ করেছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তাঁর হাতে পরাস্ত হয়েছে সব ইসলাম বিরোধী শক্তি। তাঁর প্রভাবে হিন্দের মাটিতে উলামা-আউলিয়ার হালাক্বাহ আবার শুরু হয়েছে। মদের আড্ডায় তালা লেগেছে। আকবরের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া কুরবানী পুনরায় চালু হয়েছে। হিন্দুকুশের অববাহিকায় দ্বীন ও উম্মাহ'র স্বার্থ রক্ষার্থে শাইখ আহমদ সারহিন্দী (র.) যে অতুলনীয় খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন, তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাঁর এক শতাব্দী পর হিন্দের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইলমে দ্বীনের আলোকবর্তিকা ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.)। আরও একশ বছর পর মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের পথ দেখাতে এসেছিলেন আমিরুল মুসলিমীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.)। এরা সবাই শাইখ আহমদ সারহিন্দী (র.) এর তাজদীদের চাক্ষুষ ফসল। ১০৩৪ হিজরীর ২৮ সফর ইহজগত ছেড়ে বিদায় নিয়েছিলেন ইমামে রাব্বানী শাইখ আহমদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.)। ২০১৫ সালে সারহিন্দে তাঁর কবরপাশে হাযির হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, তাঁর নিঃশ্বাসের উত্তাপ আজও ইসলামের কাফেলাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ল তাঁর প্রতি ব্যক্ত মহাকবি আল্লামা ইকবালের পঙক্তিমালা-

حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کہ ہے
زیر فلک مطلع انوار

اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس
خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے
نفس گرم سے ہے گرمی احرار

وہ ہند میں سرمایہء ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت
کیا جس کو خبردار

সাইমুন
লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী
এখানে স্কুল-কলেজ-মাদরাসার যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক কোরআন শরীফ, ধর্মীয় বই, স্কুলব্যাগ, স্টেশনারী সহ অন্যান্য গিফ্‌ট সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

পরিচালক: মাওলানা আতাউর রহমান
মোবাইল: ০১৭১৯ ৪২৮০৬৯
শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
(হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন)
সোবহানীঘাট, সিলেট

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ফিকহী মতপার্থক্য

মো. মুহিবুর রহমান

আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একজনের চেহারার সঙ্গে আরেক জনের চেহারার যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি অমিল রয়েছে এক জনের চিন্তার সঙ্গে আরেক জনের চিন্তার। সবার বোধশক্তি সমান নয়। চিন্তাজগতের বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের মধ্যকার মতপার্থক্য একটি বাস্তবতা। ফিকহ শাস্ত্রে যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবন করে শরঈ বিধান বের করা হয়, তাই এখানে মতপার্থক্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। নববীযুগ, সাহাবীযুগ, তাবিঈযুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এই মতপার্থক্য বিদ্যমান। শরঈ জ্ঞানের অভাবে অনেকে এটাকে খারাপ চোখে দেখে এবং ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়; তথাপি ইসলাম-বিদ্বেষীরা এই বিষয়ে জল ঘোলা করার পাঁয়তারা করে। তাই এই সম্পর্কে মৌলিক ধারণা রাখা সকল মুসলিমের জন্য জরুরি।

ফিকহী মতপার্থক্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগেও ছিল, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকায় মতপার্থক্যসমূহ নিমিষেই শেষ হয়ে যেত। সাহাবীগণ (রা.) যখন কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য করতেন, তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসতেন; তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতেন। এভাবেই মতপার্থক্য চুকে যেত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সাহাবীগণ (রা.) এর মধ্যে কখনো কোনো বিষয়ে ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য দেখা দিলে তা সমাধানের দুটো পদ্ধতি ছিল। যথা:

এক. উদ্ভূত ইখতিলাফ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতামত জেনে তারপর আমল করা সম্ভব হলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতামতের অপেক্ষা করতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারেই আমল করতেন।

দুই. উদ্ভূত ইখতিলাফ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতামত জেনে তারপর আমল করা, সম্ভব না হলে তারা ইজতিহাদ করে আমল করতেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করে সঠিক সিদ্ধান্ত জেনে নিতেন।

এ পর্যায়ে উপর্যুক্ত দুটো পদ্ধতির প্রায়োগিক উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ ছিল ওহী অবতরণের যুগ। সাহাবীগণ (রা.) এর চোখের সামনে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, শরঈ বিধানাবলির প্রেক্ষাপট তাঁদের সামনে ছিল পরিষ্কার। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ইখতিলাফমুক্ত ছিলেন। তবুও নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে তাঁরা মাঝেমধ্যে মতপার্থক্যে পড়ে যেতেন। এরকম উদ্ভূত ইখতিলাফ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতামত জেনে তারপর আমল করা সম্ভব হলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতামতের অপেক্ষা করতেন। তাঁর কাছে এসে শরীআতের বিধান জিজ্ঞাসা করতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারেই আমল করতেন। এরকম একটি ঘটনা বর্ণনা করছি।

আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একদল সাহাবী কোনো এক সফরে যাত্রা করেন। তাঁরা এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সে গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হলো। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কোনো উপকার হলো না। তখন তাদের কেউ বলল, এ কাফেলা যারা এখানে অবতরণ করেছে তাদের কাছে তোমরা গেলে ভালো হত। সম্ভবত, তাদের কারো কাছে কিছু থাকতে পারে। তারা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল। আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারো কাছে কিছু আছে কি? তাদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি ঝাড়-ফুঁক করতে পারি। আমরা তোমাদের মেহমানদারী কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড়-ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ কর। তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল।

তারপর তিনি গিয়ে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) পড়ে তার উপর ফুঁ দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমন ভাবে নিরাময় হলো) যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হলো এবং সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেন তার কোনো কষ্টই ছিল না। (বর্ণনাকারী বলেন) তারপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বলেন, এগুলো বণ্টন কর। কিন্তু যিনি ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন, তিনি বললেন এটা করব না, যে পর্যন্ত না আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে তাঁকে এই ঘটনা জানাই এবং লক্ষ্য করি তিনি আমাদের কী হুকুম দেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, সূরা ফাতিহা একটি দুআ? তারপর বললেন, তোমরা ঠিকই করেছ। বণ্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ। এ বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন। (বুখারী, হাদীস নং ২২৭৬)

দুই. সাহাবীগণ (রা.) কখনো কখনো দ্বীনি কাজে মদীনা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করতেন। এ সময়ে উদ্ভূত ইখতিলাফ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতামত জেনে তারপর আমল করা সম্ভব হত না। এক্ষেত্রে তারা কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি অনুসারে ইজতিহাদ করে আমল করতেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করে সঠিক সিদ্ধান্ত জেনে নিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এ সংক্রান্ত বেশ কিছু ঘটনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কিছু বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ক. ওহী অবতরণের যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশাতেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ (রা.) ইজতিহাদ করেছেন। কখনো কখনো এই ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভিন্ন মত সৃষ্টি হয়েছে। ইজতিহাদের উপর নির্ভর করে একেক জন একেক রকম আমল করেছেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার আমলকেই সমর্থন করেছেন। কাউকেই দোষারোপ করেননি। এরকম একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ সমাপ্তির দিন) বলেছেন, বনূ কুরাইযার মহল্লায় না পৌঁছে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই সালাত আদায় করব, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় সালাতের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী ﷺ এর কাছে ওঠানো হলে তিনি তাদের কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি। (বুখারী, হাদীস নং ৩৮৯৩)

এই হাদীসে ফিকহী মতপার্থক্যের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। মতপার্থক্য মানেই যদি নিন্দনীয় বিষয় হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশাতেই সাহাবীগণ (রা.) মতপার্থক্য করতেন না এবং তিনি তাদেরকে সংশোধন না করে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতেন না।

হাফিয আব্দুর রহমান আস-সুহাইলী (র.) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ বলেন, "এ হাদীস থেকে দুটো বিষয় বুঝা যায়,

১. আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করা যেমন দূষণীয় নয়, তেমনি ইজতিহাদের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করাও নিন্দনীয় নয়।

২. শরীআতের অপ্রধান বিষয়সমূহে মুজতাহিদগণের সকলেই সঠিক। তাঁদের কাউকেই ভ্রান্ত বলা যাবে না।" (ইবন হাজার, ফাতহুল বারী, খ. ৭, পৃ. ৪০৯, ড. আহমদ আলী, তুলনামূলক ফিকহ, পৃ. ৯৭-৯৮)

খ. কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাহবীগণের ইজতিহাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়কেই সঠিক বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। যেমন, আতা (র.) থেকে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হন। পথিমধ্যে তাঁদের নামাযের সময় হয়। তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেন। অতঃপর উক্ত নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়ায় তাদের একজন উযূ করে পুনরায় নামায আদায় করলেন এবং অপর ব্যক্তি নামায আদায় করা হতে বিরত থাকেন। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে হাযির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন। যিনি নামায পুনরায় আদায় করেননি, তাকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ -তুমি সুন্নাহ (সঠিক নিয়ম) পালন করেছো, তোমার ঐ নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট।" আর যিনি উযূ করে পুনরায় নামায পড়েছেন, তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ -তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব"। (আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৩৮)

গ. ইজতিহাদের কারণে সৃষ্ট ফিকহী মতপার্থক্যের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো নির্দিষ্ট এক পক্ষকে সঠিক বলে ঘোষণা করতেন। যেমন, আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ এর সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে তিনি মক্কার কোনো এক রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছলে তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ পেছনে পড়ে গেলেন। তাঁরা ছিলেন ইহরাম বাধা অবস্থায়। আর তিনি ছিলেন ইহরাম ছাড়া অবস্থায়। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে তার ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন। তারপর সাথীদের তাঁর হাতে চাকু তুলে দিতে অনুরোধ করলেন। তারা অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি নিজেই সেটি তুলে নিলেন এবং গাধাটির পিছনে দ্রুতবেগে ছুটলেন এবং সেটিকে হত্যা করলেন। নবী ﷺ এর সাহাবীদের কেউ কেউ তা খেলেন আবাব কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। পরিশেষে তারা যখন নবী ﷺ এর কাছে পৌঁছলেন তখন তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, «إِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ» -"এটি তো এমন খাদ্য যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের খাওয়ার জন্য দিয়েছেন।" (বুখারী, হাদীস নং ৫১৭২; মুসলিম, হাদীস নং ২৯০৯)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, "এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ইজতিহাদ মতো আমল করা যাবে, যদিও দুজন মুজতাহিদ পরস্পর বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তদুপরি এ দুজনের কাউকেও তাঁদের ইজতিহাদের জন্য দোষারোপ করা যাবে না।" (বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, খ. ১৬, পৃ. ৩২; ড. আহমদ আলী, তুলনামূলক ফিকহ, পৃ. ৯৯)

ঘ. কিছু ক্ষেত্রে কোনো একজন সাহাবী (রা.) ইজতিহাদ করতেন এবং অন্যদের কাছে সেটা অপছন্দনীয় লাগতো। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বিষয়টি জানালে তিনি সেই ইজতিহাদ অনুমোদন করতেন। যেমন,

আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাতুস সালাসিলের যুদ্ধে একদা শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার আশংকা হল যে, যদি এই সময় আমি গোসল করি তবে মারা যাব। আমি তায়াম্মুম করে আমার সাথিদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করি। অভিযান থেকে ফিরে এসে আমার সঙ্গীরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অবহিত করেন। তিনি এটা শুনে বললেন, হে আমর! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সাথিদের নিয়ে নামায আদায় করলে? আমি তাকে আমার গোসল করার অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করলাম এবং আরো বললাম, আমি আল্লাহ তাআলাকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা নিজেদের হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান' [সূরা নিসা, আয়াত ২৯]। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু না বলে মুচকি হাসি দেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৩৪)

ঙ. কিছু ঘটনায় দেখা যায়, সাহাবীদের ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের তিরস্কার করেছেন। বিশেষত যারা ইজতিহাদের অযোগ্য, তাঁরা ইজতিহাদ করলে তিনি অপছন্দ করতেন। যাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই, তারা ইজতিহাদ করলে বড় ধরণের ক্ষতি হয়ে যায়। এজন্যই তাদের জন্য জরুরি হল, প্রকৃতপক্ষে যোগ্য মুজতাহিদদের অনুসরণ করা। যেমন,

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমাদের জনৈক সাথির মাথা ফেটে যায়। পরবর্তীতে তার গোসল ফরয হলে তিনি এ অবস্থায় তায়াম্মুম করার কোনো সুযোগ আছে কি-না জানতে চাইলেন। সাথিরা বললেন, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহার করতে পারছো, তাই তোমার তায়াম্মুম করার কোনো সুযোগ নেই। তখন তিনি বাধ্য হয়ে গোসল করলেন। এতে তার মৃত্যু হল। আমরা মদীনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি তাঁর সাথিদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে বললেন,

«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ». أَوْ «يَعْصِبَ». شَكَّ مُوسَى «عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

-তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করুন! জানা না থাকলে তারা জিজ্ঞাসা করে নিল না কেন? জিজ্ঞাসাই তো হল অজ্ঞতার শিফা। তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে তায়াম্মুম করবে অথবা ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধবে এবং তার উপর মাসেহ করবে আর শরীরের অন্যান্য অংশ ধুয়ে ফেলবে। (আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৩৬; বাইহাকী, হাদীস নং ১৮১)

ফিকহী মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগের মুসলমানগণ সন্দেহে নিপতিত হতেন না, দলাদলি করতেন না। ইখতিলাফ করার কারণে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হত না। কেননা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন তাঁদের সামনে ছিলেন। তিনি যে ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত দিতেন, সকলেই তা মানতে বাধ্য ছিলেন, তাঁর ব্যাখ্যাই শরীআত হয়ে যেত। পরবর্তী যুগ সমূহে অনিবার্য কারণেই ইজতিহাদের প্রয়োগ বেশি হয়, তাই ফিকহী মতপার্থক্য বিস্তৃত হয়। এ প্রসঙ্গে গভীর অধ্যয়ন ও অনুধাবন করলে এর বাস্তবতাও ফুটে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

ভারত সফরে কয়েকদিন

রুহুল আমীন খান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

নয়াদিল্লী বর্তমান, পুরানা দিল্লী ইতিহাস। সেই ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে দু'চার কদম হাঁটার অদম্য আগ্রহ নিয়ে হাযির হলাম দিল্লীর ঐতিহাসিক জামে মসজিদের পূর্ব ফটকে। সেকালে পূর্ব ফটক ছিল রাজা-বাদশা, আমীর-উমরাগণের জন্য নির্দিষ্ট আর উত্তর-দক্ষিণের ফটক জনসাধারণের জন্য। এখন সেকালও নেই, আর নিয়মও নেই ।

দীর্ঘ সোপান বেয়ে সুউচ্চ প্রবেশদ্বারে পৌঁছে সোপানে বসে দৃষ্টি মেলে ধরলাম পূর্বের পানে। লাল কেল্লার বুরুজ ছুঁয়ে মন ছুটে চলল পেছন থেকে আরও পেছনে। দিল্লী অঞ্চল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হিসেবে মর্যাদা পেয়ে আসছে সুপ্রাচীন থেকেই। এর ৫০/৬০ বর্গমাইল এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তার অসংখ্য নিদর্শন। মহাভারতে উল্লেখিত প্রাচীন শহর ইন্দ্রপ্রস্ত ছিল দিল্লীর সমভূমিতেই। সম্রাট শাহজাহানেরও অনেক আগে রাজপুতরা লালকেল্লা (Redford) নামে দুর্গ শহর গড়ে তুলেছিল ১০৫২ সালে। মুসলিম সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি ১১৯২ সালে সে দুর্গ অধিকার করে কায়িম করেন সুলতানী শাসন । ১৩৯৮ সালে দুর্ধর্ষ আক্রমণকারী চেংগীজ খাঁর আক্রমণে ও লুণ্ঠনে লণ্ডভণ্ড হয় দিল্লী। ১৫৫৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সম্রাট বাবর পরাজিত করেন ইব্রাহীম লোদীকে। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করেন মুগল সাম্রাজ্য। তিনি রাজধানী স্থাপন করেন আগ্রায়। হুমায়ুন, আকবরেরও রাজধানী ছিল ওই অঞ্চলেই। দিল্লীকে রাজধানী করার সিদ্ধান্ত নেন সম্রাট শাহজাহান। শাহজাহান ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের ৫ম সম্রাট। ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাঁর শাসনকাল। এ সময়টিই মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। শাহজাহানকে বলা হয় প্রিন্স অব আর্কিটেকচার। বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল,

লালকেল্লা, সাত মসজিদ, শালিমার বাস (লাহোর) দেওয়ানে খাস, দেওয়ানে আম, ময়ুর সিংহাসনের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৩৮ সালে নির্মাণ করেন চারদিক ঘিরে সুউচ্চ প্রস্তর প্রাচীর এবং প্রাচীর অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করেন সুবিখ্যাত লালকেল্লা (Redford)। এই কেল্লার মাঝে হিরেমুক্তা, জওয়াহেরাত, সুলোভিত সুরম্য দিওয়ানে খাস এবং এই অতুলনীয় প্রাসাদ গাত্রে উৎকীর্ণ করেন এই কবিতার পংক্তি : আগার জান্নাত বররোয়ে যমীনস্ত/হমিনস্ত হমিনস্ত হমিনস্ত। বেহেশত যমীনে যদি থাকে কোন খানে/এই খানে এই খানে তাহা এই খানে। প্রতিষ্ঠা করেন দিওয়ানে আম। দীর্ঘ ৭ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেকালীন এক কোটি মুদ্রা ব্যয়ে স্বর্ণ, হিরা, মরকত মণি দিয়ে নির্মাণ করান ৩ গজ দৈর্ঘ্য, ২ গজ প্রস্থ এবং ৫ গজ উচ্চতাবিশিষ্ট জগৎ বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সিংহাসন। ১৭৩৯ সালে নাদীর শাহ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় দিল্লী। তিনি ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনূর মনি নিয়ে যান নিজ দেশ পারস্যে। সেখান থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিয়ে যায় লন্ডনে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ (প্রথম আজাদী লড়াই) ব্যর্থ হওয়ার মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় ব্রিটিশ শাসন। লালকেল্লার মিনার শীর্ষে উড্ডীন হয় ইউনিয়ন জ্যাক। ১৯১২-১৯৩১ পর্যন্ত পুরানা দিল্লীই থাকে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। নয়াদিল্লী নির্মাণ সম্পন্ন হলে সেখানে হয় স্থানান্তরিত। ওই অনতিদূরে যে স্থানটিতে আজ ক্রীড়াকেন্দ্র সেখানে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের দিল্লী দরবার বসেছিল ১৮৭৭, ১৯০৩ ও ১৯১১ সালে। ওই লালকেল্লায় ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ঘোষণা করা হয়েছিল ভারত সম্রাজ্ঞী। তারপর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ইউনিয়ন জ্যাক হল চিরদিনের জন্য অবনমিত, অপসারিত। উড্ডীন হল স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা। ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই লালকেল্লার লাহোরী গেট সংলগ্ন স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই লালকেল্লা থেকেই ব্রিটিশরা সম্রাট বাবরের ২০তম উত্তরাধিকারী সম্রাট বাহাদুর শাহকে গ্রেফতার করে নির্বাসন দেয় রেঙ্গুনে (মায়ানমার) এবং শাহজাদাদের ধরে এনে কেল্লার সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। নির্বাসিত বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ৮৩ বছর বয়সে। ইতিহাসের ময়দানে ধাবমান অশ্বের গতি হঠাৎ থেমে গেল জামে মসজিদের মিনার শীর্ষ থেকে ভেসে আসা সালাতুল আসরের সুমধুর আযান ধ্বনিতে। মনোযোগ দিলাম মসজিদের দিকে।

রেডফোর্ডের সম্মুখভাগে, অদূরে ১৬৪৪-৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান নির্মাণ করেন এই জামে মসজিদ। এখানে একসাথে নামায আদায় করতে পারেন ২৫ হাজার মুসল্লি। সম্রাট উজবিকিস্তানের বোখারা থেকে একজন ইমাম এনে তাঁর দ্বারা উদ্বোধন করান এই মসজিদ। স্থাপত্য উৎকর্ষের অনন্য দৃষ্টান্ত এই বিশালায়তন জামে মসজিদ শুধু দুনিয়ার সুন্দরতম মসজিদগুলোরই একটি নয়, দুনিয়ার সুরম্য ভবনসমূহেরও অন্যতম। সুদীর্ঘ সোপান বেয়ে উঠতে হয় এর সুউচ্চ চত্বরে, ৩২৫ বর্গফুট এ উন্মুক্ত চত্বরের আয়তন। চত্বরের পূর্ব-উত্তর-দক্ষিণ তিনদিক বেষ্টন করে নির্মাণ করা হয়েছে খিলানযুক্ত কক্ষশ্রেণি। এ তিন দিকেরই মধ্য বরাবর সুউচ্চ সুদৃশ্য তোরণ। সুবিশাল চত্বরের পশ্চিম প্রান্তে ২০০'x৯০' আয়তনের মূল মসজিদ ভবন। ভবনের সম্মুখভাগের মধ্যস্থলে খিলানযুক্ত নয়নাভিরাম বিশাল সিংহদ্বার। দু'পাশে তার ৫টি করে আরো ১০টি সুসমঞ্জস দরওয়াজা। মসজিদ ভবন শীর্ষে সঙ্গে মর্মর নির্মিত সুদৃশ্য গম্বুয। মাঝখানেরটি সুউচ্চ দু'পাশের দুটি তার থেকে নিচু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। গঠন বৈচিত্র্যে, শিল্প নৈপুণ্যে যেমন, স্থায়িত্বেও তেমনি। দেখে মনে হয় এই সেদিনের গড়া। সুদীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছর পাড়ি দিয়েও দেহ তার অটুট, সৌন্দর্য অম্লান।

জামে মসজিদের জামাআতে নামায আদায় করে এগিয়ে গেলাম ইতিহাস বিখ্যাত Redford এর দিকে। বিদায়ী সূর্যের লোহিত আভায় তখন আরও রক্তিম হয়ে উঠেছে লালকেল্লার লাল প্রাচীর। ইতিহাস এখানে কথা কয়। কালের প্রবাহ যেন থমকে দাঁড়ায়। দীর্ঘ বুরুজ, বিশাল তোরণ, দিওয়ানে আম, দিওয়ানে খাসের মমিরা এখনো ঘোষণা করে সেই ধন, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, দাপট, প্রতাপ-পরাক্রম, শৌর্যবীর্য বার্তা। যেমন দেখার আছে, তেমনি ওর বুকে, পাঁজরে কান লাগিয়ে শোনারও আছে। আর উপলব্ধি করার আছে অনেক কিছুই। কাবুল, কান্দাহার থেকে বার্মা মায়ানমার পর্যন্ত আর তিব্বত নেপাল থেকে সিংহল শ্রীলঙ্কা হয়ে আরব সাগরের মালদ্বীপ পর্যন্ত যাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, সেই সম্রাটদের আখেরী মসনদ নশিনের জন্য সাড়ে তিন হাত গোরের জায়গাও হয়নি ভারতবর্ষের মাটিতে! সত্যিই ইতিহাস বড় নির্মম।

লালকেল্লার ঠিক দক্ষিণে যমুনা তীরে রাজঘাট। এখানেই শবদাহ হয়েছে গান্ধীজীর। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী সবারই শেষকৃত্য সম্পাদিত হয়েছে যমুনা তীরের রাজঘাটে। একের পর এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রচনা করা হয়েছে তাদের শেষ নিবাস। বিরাট, বিশাল অঞ্চলব্যাপী ঘন সবুজ শ্যামল উদ্যান। কোলাহলমুক্ত সৌম্য শান্ত মৌন গম্ভীর পরিবেশ। প্রয়াত নেতাদের মরণোত্তর এলাকা। জাতির জন্য তারা দিয়েছে অনেক কিছু। জাতিও তাদের স্মরণ করছে পরম শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে। গান্ধীর জীবন শিক্ষা, দর্শন, মতবাদ, রাজনীতি নিয়ে গবেষণা চর্চার জন্য বিভিন্ন স্থানে গড়ে তুলেছে বহু প্রতিষ্ঠান। তার শেষকৃত্য স্থান যেন ভারতীয়দের কাছে পবিত্র তীর্থ কেন্দ্র। আমরা তোরণ পেরিয়ে সামনে এগিয়ে দাঁড়ালাম সমাধি বেদিকার পার্শ্বে। সুপ্রশস্ত নাতিউচ্চ প্রস্তর বেদিকার মধ্যস্থানে জ্বলছে শিখা অনির্বাণ। নব্য ভারতের স্থপতির প্রতি ভারতীয় নাগরিকদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা অপরিসীম। পাকিস্তানের স্থপতি জিন্নাহর প্রতিও এমনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি দেখেছি পাকিস্তানে। এমনটা দেখেছি আরো অনেক দেশে। তাদের নিয়ে বিতর্কের ঝড় নেই। থাকা উচিৎ নয়। আসলে ইতিহাসে যার যেখানে অবস্থান, যার যেটুকু পাওনা, তা তাকে দেওয়ার মধ্যেই আছে মহত্ত্ব।

ঘনিয়ে এসেছে দিল্লী ত্যাগের সময়। এরপর যাত্রা আগ্রা, ফতেহপুর সিক্রি, জয়পুর হয়ে সুলতানে হিন্দের দরবার আজমীর শরীফে। এর আগে অবশ্যই যিয়ারত করে যেতে হবে উপমহাদেশের সকল উস্তাদের উস্তাদ, সকল যিন্দা সিলসিলার পীরানে পীর, মহান চিন্তানায়ক, মহান সংস্কারক হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) এবং তাঁর সুমহান আওলাদদের মাকবারাহ। জামিআয়ে রহীমিয়ার পার্শ্বে বুস্তানুল মুহাদ্দিসীনে চিরন্দ্রিায় শায়িত রয়েছেন উস্তাযুল আসাতিযাহ, শাইখুল মাশায়িখবৃন্দ। কিন্তু হায়, সে জামিআয়ে রহীমিয়াই চিনেন না আমাদের ড্রাইভার এবং গাইড। ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্জ মাওলানা এম এ মান্নানের সাথে দিল্লীতে এসেছিলাম ৩৭ বছর আগে ইনকিলাবেরই প্রিন্টিং মেশিন কেনার জন্য এবং তখন তার সাথে গিয়েছিলাম বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন যিয়ারতে। পথঘাট না চিনলেও মনে ছিল স্থানটি মাওলানা আযাদ মেডিকেল কলেজ এলাকায়। সেই ক্লু ধরে অবশেষে হাযির হলাম যথাস্থানে।

সফরকারী এ দলের প্রত্যেকেই দেশের প্রখ্যাত আলিম। এদের প্রত্যেকেরই যাহিরী এবং বাতিনী উভয়দিকের সম্পর্ক বিদ্যমান এখানে শায়িত মহামনীষীদের সঙ্গে। শুধু তাদেরই নয়, উপমহাদেশের প্রায় সকল ধারা, সকল মসলকের পীর-মাশায়িখ, আলিম-উলামা, মুহাদ্দিস, মুফাসসীর, ফকীহ, মুফতীগণের উর্ধ্বতন পীর ও উস্তাদ এই কামিল ব্যক্তিগণ। ওই তো শুয়ে আছেন শাহ আবদুর রহীম। তাঁর পাশেই ওই তো শায়িত তার সুযোগ্য পুত্র আলিমকুল শিরোমনি বিপ্লবী চিন্তানায়ক শাহ ওয়ালীউল্লাহ। তার এপাশে-ওপাশে ওই তো শায়িত তার সুযোগ্য পুত্র চতুষ্টয়- শাহ আবদুল আযীয, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ আবদুল কাদির ও শাহ আবদুল গণী (র.)। তাদের থেকে এখনো বিকীর্ণ হচ্ছে ইলমের দ্যুতি। রূহানীয়াতের খুশবু। এ মহান খান্দানের কাছে চিরঋণী উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ।

শুরু হয়ে গেছে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ। আমীর-উমরা, শাসকবর্গ মত্ত গৃহবিবাদে, ভোগ-বিলাসে, ইন্দ্রিয় পূজায়। দিকে দিকে ধূমায়িত বিদ্রোহের দাবানল। সাম্রাজ্যব্যাপী অশান্তি, বিশৃঙ্খলা। উলামারা মশগুল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের দার্শনিক বিতর্কে। আওয়ামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ভোগলিপ্সা, শিরক, বিদআত, কুসংস্কার। সারা ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ধূর্ত ইংরেজ। এই ঘোর দুর্দিনে ফারুকে আযমের বংশধর পীরে কামিল শাহ আবদুর রহীমের ঘরে ১৭০৪ ঈসায়ী সালের ১৪ শাওয়াল জন্ম নেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)।

শরীআত ও মারিফতের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের পর এই মহামনীষী ঝাঁপিয়ে পড়েন কর্মক্ষেত্রে। সমকালীন পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠে ইসলাহে নফস, ইসলাহে কওম ও ইসলাহে হুকুমতের লক্ষ্য নিয়ে তিনি সূচনা করেন ‘ফক্কেকুল’ অর্থাৎ এক সর্বাত্মক বিপ্লবের। তিনি খানকার গদ্দীনশীনদের, যুগের আলিমদের, হুকুমতের আমীর-উমরাদের, সেনাবাহিনীর সদস্যদের, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষদের দোষক্রটিগুলো দেখিয়ে দেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে। বাতলান সংশোধনের পন্থা ও পদ্ধতি। তিনি রচনা করেন শতাধিক কালজয়ী গ্রন্থ। তার জ্ঞান-মনীষা দূরদৃষ্টি দেখে বিস্ময়াভূত হতে হয় এ যুগের মানুষদেরও। তাঁর অমর গ্রন্থাবলীর কোন কোনটিতে রয়েছে এ আধুনিককালের জটিল সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ। রয়েছে এ যুগের সমস্যাবলীরও সুষ্ঠু-সুন্দর সমাধান।

শাহ ওয়ালীউল্লাহর ইন্তিকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তার সুযোগ্য ছাহেবজাদা শাহ আবদুল আযীয (র.)। তিনি তাঁর মহান পিতা ও মুরশিদের আন্দোলনকে করে তোলেন আরও সুগঠিত ও সম্প্রসারিত।

ইতোমধ্যে পলাশীর আম্রকাননে পতন হয়েছে নবাব সিরাজের। অস্তমিত হয়েছে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য। বণিকের মানদণ্ড রুপান্তরিত হয়েছে রাজদণ্ডে। বিস্তৃত হয়েছে তাদের আগ্রাসী থাবা। সারা ভারতের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসেছে ব্রিটিশ শাসন।

শাহ আবদুল আযীযের আন্দোলন চলল দুই পদ্ধতিতে। একদিকে তিনি চালাতেন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার, অপরদিকে বিদেশি শাসন উচ্ছেদের তৎপরতা। তার পরিচালিত এই আন্দোলনের নামই তারগীবে মুহাম্মদিয়া বা ত্বরীকায়ে মুহাম্মদিয়া। এর মাধ্যমে চলল মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়া কুসংস্কার উচ্ছেদের অভিযান। চলল খাঁটি ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত করে তোলার কাজ। রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে তিনি জারী করলেন এক অসম সাহসী বিপ্লবী ফাতওয়া। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ ফাতওয়ার প্রভাব অতুলনীয়। এই ফাতওয়ায় ঘোষণা করা হল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত হচ্ছে দারুল হরব। মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে বিদেশি শাসন উচ্ছেদের জন্য জিহাদ করা, অন্যথা এদেশ থেকে অন্য কোন মুসলিম দেশে হিজরত করা। এই ফাতওয়ার প্রভাবে তারগীবে মুহাম্মদিয়া আন্দোলন পরিণত হয় ব্রিটিশবিরোধী আযাদী আন্দোলনে। যার নেতৃত্ব দেন সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলবী (র.)।

সে জিহাদ আপাত সফল না হলেও শাহ ছাহেবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে উপমহাদেশের দিকে দিকে। মুসলমানরা বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ অগ্নিগর্ভ শতবর্ষে পরিলক্ষিত এ বিপ্লবী ফাতওয়ারই অপরিসীম প্রভাব। যার চরম বিস্ফোরণ ঘটে মহাসিপাহী বিদ্রোহ বা আযাদীর প্রথম সর্বাত্মক লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে।

প্রখ্যাত লেখক আবদুল মওদুদ লিখেছেন, ‘আফসোস! সে জিহাদ আন্দোলনের, সে মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। যে অগণিত জনসমষ্টি সতেরোশ সাতান্ন থেকে আঠারোশ সাতান্ন পর্যন্ত বিদ্রোহে, সমরে, ফাঁসির মঞ্চে জীবনপাত করে গেছে, আজ তারা অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পশ্চাতে এই দাবি নিয়ে যে, তাদেরও মহৎ আত্মত্যাগের মর্যাদা দিতে হবে।’

এই মহামনীষীদের পরিচয় নিতে নিতে জনাব বাহাউদ্দীন বললেন, ‘আমাদের সাথে আত্মিক সম্পর্কের দিকটা আরো একটু খুলাসা করে তাঁদের বলুন। বললাম, আপনারটা দিয়েই শুরু করি। আপনার পিতা আলহাজ্জ মাওলানা এম এ মান্নানের পিতা শাহ ইয়াসীন হলেন ফুরফুরার মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকীর খলীফা। তাঁর পীর হযরত সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী। তাঁর পীর বালাকোটের গাযী হযরত সুফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী। তাঁর পীর হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদে বেরলবী বালাকোট। তার পীর হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী। তাঁর পীর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী। তাঁর পীর হযরত শাহ আবদুর রহীম (র.)। এমনি করে হাদীসের সনদের দিক দিয়ে, তরীকতের সিলসিলার দিক দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই সম্পর্কিত ওই কবরগাহে শায়িত ওলীয়ে কামিলদের সঙ্গে। এভাবে ছারছিনী, ফুরফুরী, বাহাদুরপুরী, ফুলতলী, জৈনপুরী, চরমোনাই, দেওবন্দী, মাদানী, থানবী যত ধারা আছে যাহিরী ও বাতিনী ইলমের সবের উৎসমুখ ওই শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)। সেই উৎসকেন্দ্রে পৌঁছে আমরা সবাই আবেগাপ্লুত। নয়নে সবার আসুর ফোয়ারা। নিরাভরণ, নিতান্ত মামুলী গায়ে গায়ে মেশানো সব কবর। নাইবা থাকুক এখানে প্রবেশের বুলন্দ দরওয়াজা, আকাশচুম্বী মিনার, সুদৃশ্য গম্বুজ, শ্বেতমর্মর নির্মিত নয়নাভিরাম সমাধি সৌধ, কি-ইবা আসে যায় তাতে। তারা আসীন অসংখ্য, অগণিত ভক্ত, অনুরক্তের হৃদয় সিংহাসনে। প্রস্তর নির্মিত স্মৃতিসৌধ, কারুকার্য বিখচিত হর্ম্যরাজি একদিন কালের গর্ভে লীন হয়ে যাবে কিন্তু কৃতী সৌধ রবে অম্লান, চিরভাস্বর।

(চলবে)

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)	৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)	৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)	২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)	১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)	৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%, ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন
তাসনীম
www.tasneembd.org
▼কুরআন ▼হাদীস ▼আকীদা
▼ইবাদত ▼প্রবন্ধ ▼জীবনী
▼জিজ্ঞাসা ▼বই

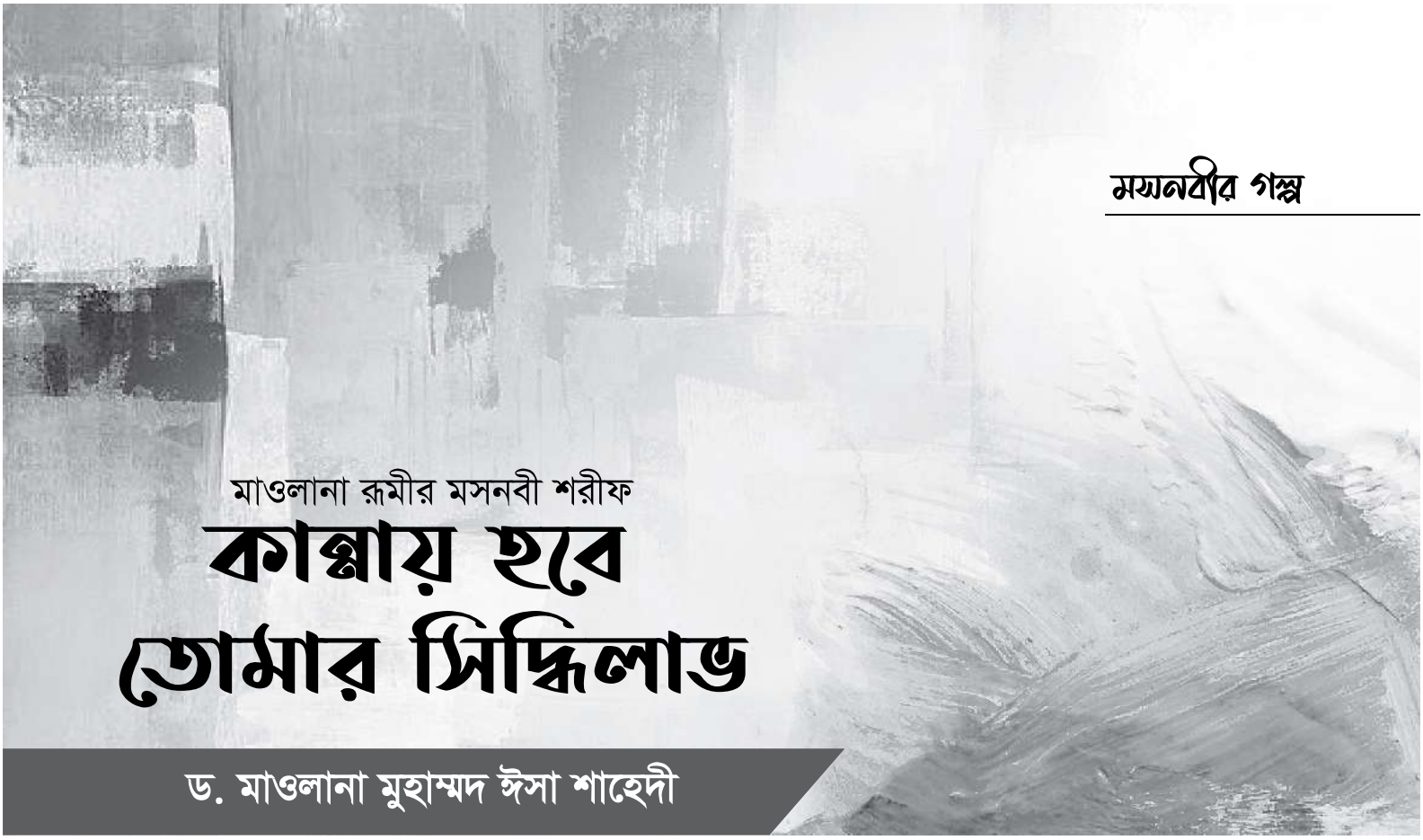

মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ

কাল্পায় হবে তোমার সিদ্ধিলাভ

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

আগেকার দিনের এক বাদশাহর কাহিনী। তিনি ছিলেন দুনিয়ার বাদশাহ, সাথে দীনের বাদশাহীও ছিল তার করায়ত্বে। একদিন বাদশাহ শিকারে বের হলেন লোক লস্কর নিয়ে। দূরে বনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে এক বিপত্তি ঘটে। পথের দ্বারে এক রূপসী দাসী তার নযর কাড়ে। বাদশাহ শিকারে যাচ্ছিলেন; কিন্তু নিজেই শিকার হয়ে গেলেন দাসীর রূপ দেখে। অনেক অর্থকড়ি দিয়ে বাদশাহ দাসীকে খরিদ করে আনলেন প্রাসাদে। তাকে মনের সিংহাসনে বসাবেন এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাজপ্রাসাদে এসে দেখা দিল আরেক বিপত্তি। হঠাৎ দাসী অসুস্থ হয়ে পড়ল । তাতে দুশ্চিন্তায় বাদশাহর আরাম হারাম হয়ে গেল। মাওলানা রূমী (র.) এখানে ব্যক্ত করেন মানব জীবনের এক অমোঘ সত্য।

آن یکی خر داشت و پالانش نبود
یافت پالان گرگ خر را در ربود

আ'ন য়্যকী খার দা'শ্‌ত্‌ ও পা'লা'নাশ নাবূদ
য়া'ফত পা'লা'ন গোর্গ খাররা' দার রুবূদ

এক লোকের গাধা ছিল কিন্তু ছিল না গাধায় বসার গদি
গদি যোগাড় হল তো নেকড়ে এসে ছিনিয়ে নিল গাধি।

একজনের গাধা ছিল কিন্তু গাধার পিঠে বসার গদি জোগাড় করতে পারে নি। একদিন যখন গদি জোগাড় হল হঠাৎ গাধাটি মারা গেল। দুনিয়াতে সব অভাব একসাথে পূরণ হয় না। একটি পূরণ হলে আরেকটি অভাব দেখা দেয়। এটিই দুনিয়ার জীবনের শাশ্বত রীতি।

کوزہ بودش آب می نامد بدست
آب را چون یافت خود کوزہ شکست

কূযে বূদেশ আ'ব মী না'মদ বেদাস্ত
আ'বরা' চোন য়া'ফত খোদ কূযে শেকা'স্ত

কারো কলসি ছিল, ছিল না পানির জোগাড়
পানি পেল তো একদিন ভেঙ্গে গেল কলসি তার।

পার্থিব জীবনের ধর্মই এমন। একটা মিলে তো আরেকটা মিলে না। সব ইচ্ছা একসাথে পূরণ হয় না, সব সুখ একসাথে পাওয়া যায় না। জীবনের এই বাস্তবতায় যার বিশ্বাস নাই, তার জীবন অশান্তিতে ভরা। বান্দাকে নিজের দিকে মুহতাজ রাখার জন্যে আল্লাহ তাআলার এই শাশ্বত বিধান। যারা এই রহস্য বুঝে না তারা জীবনছন্দে সামান্য ব্যত্যয় ঘটলে অস্থিরতায় কাতরায়। অথচ জীবন ও জগতের এই শাশ্বত নিয়ম মেনেই জীবন যুদ্ধে সফল হতে হয়।

বাদশাহ উপায়ান্তর খুঁজতে লাগলেন। দেশের সেরা হেকিমদের জড়ো করলেন তিনি প্রাণাধিক প্রিয় বাঁদীর চিকিৎসার জন্যে। দাসীর চিকিৎসায় সাফল্যের বিনিময়ে নানা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে বললেন, মনে রাখবেন, দাসীর প্রাণ বাঁচলে বাদশাহর প্রাণ রক্ষা পাবে। বাদশাহর আবেগপূর্ণ বক্তব্য আর পুরস্কারের ঘোষণা শুনে ডাক্তাররা বললেন, জাঁহাপনা! চিন্তা করবেন না। আমরা পরস্পর সহযোগিতায় আপনার রোগীর সুচিকিৎসা করব। চিকিৎসায় আমাদের সাফল্যের ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। কারণ আমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

هر یکی از ما مسیح عالمیست
هر الم را در کف ما مرهمیست

হার য়্যকী আয মা' মসীহে আ'লমীস্ত
হার আলম রা' দার কাফে মা' মারহামীস্ত

আমরা প্রত্যেকে বিশ্বখ্যাত মসীহতুল্য চিকিৎসায়
যে কোনো রোগের চিকিৎসা আমাদের কব্জায়।

'মসীহ' হযরত ঈসা (আ.) এর উপাধি। তিনি হাত বুলিয়ে দিলে জন্মান্ধ ভাল হয়ে যেত। আল্লাহ্‌র নাম ধরে ডাক দিলে মৃত লোক কবর থেকে জিন্দা হয়ে বেরিয়ে আসত। তাই তিনি অসাধারণ অলৌকিক চিকিৎসকের দৃষ্টান্ত। ডাক্তাররা নিজেদেরকে মসীহ -এর সাথে তুলনা করলেন। বললেন, আমাদের চিকিৎসায় আপনার রোগী সম্পূর্ণ ভালো

হয়ে যাবে। এ কথায় তাদের এই আত্মবিশ্বাস সীমা ছাড়িয়ে গেল। 'আমাদের চিকিৎসায় ইনশাআল্লাহ–আল্লাহ যদি চান আপনার রোগী ভালো হয়ে যাবে' অহংকারের বশে কথাটি এভাবে বললেন না।

گر خدا خواهد نگفتند از بطر
پس خدا بنمودشان عجز بشر

গার খোদা' খা'হাদ নাগোফতান্দ আয বতর
বস খোদা' বেনামূদেশা'ন ইজ্‌যে বশর

অহংকার বশে 'আল্লাহ্ যদি চান' কথাটি বললেন না
ফলে আল্লাহ তাদের দেখিয়ে দিলেন মানুষের অক্ষমতা।

'আল্লাহ যদি চান' অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলা আল্লাহ্‌তে সমর্পিত বান্দাদের অলংকার। কুরআন মাজীদে সূরা কলমে ইনশাআল্লাহর গুরুত্ব বর্ণনায় একটি অমূল্য শিক্ষণীয় ঘটনা আছে। তারই তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে এখানে। ইনশাআল্লাহ অতিমাত্রার আত্মবিশ্বাস আর অহংকারকে নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহর শক্তির সাথে মানুষের চেষ্টাকে সংযুক্ত করে। কিন্তু ডাক্তাররা এই সত্যটি বুঝতে পারেন নি। তারা অহঙ্কারের শিকার হলেন। তাই চিকিৎসার জোরে রোগীকে ভালো করতে পারবেন বলে দাবি করলেন। ফলে তাদের সবকিছুতে তালগোল পেকে গেল। চিকিৎসার ফল হতে লাগল উলটো।

তবে এই ইনশাআল্লাহ বলার অর্থ কথায় কথায় মুখের বুলি আওড়ানো নয়। বরং তা হতে হবে অন্তর-নিঃসৃত উচ্চারণ। আল্লাহর কাছে মনের অনুভূতি অভিব্যক্তিই বিবেচ্য। মাওলানা বিষয়টি বুঝিয়ে বলছেন-

ترک استثنا مرادم قسوتیست
نه همین گفتن که عارض حالتیست

তরকে এস্তেস্‌না' মোরা'দম ক্বাসওয়াতীস্ত
না হামীন গোফতান কে আ'রেয হা'লতীস্ত

ইনশাআল্লাহ ত্যাগ বলতে মনের রুক্ষতাই বুঝাতে চাই
নিছক মুখে উচ্চারণ নয়, তা তো স্রেফ কৃত্রিমতা।

কথায় কথায় ইনশাআল্লাহ বলা উদ্দেশ্য নয়। তাতে কৃত্রিমতা থাকতে পারে, অভ্যাসের কারণেও উচ্চারণ করতে পারে। কারণ আল্লাহ্‌র এমন অনেক বান্দা আছেন, যারা কথায় কথায় ইনশাআল্লাহ না বললেও তাঁদের হৃদয়মন যুক্ত থাকে ইনশাআল্লাহর মূল উৎস মহান আল্লাহ্‌র সাথে।

ای بسا ناورده استثنا بگفت
جان او با جان استثناست جفت

এই বসী না ওয়ার্দে এস্তেস্‌না' বেগোফ্‌ত্
জা'নে উ বা' জা'নে এস্তেস্‌না'স্ত জোফ্‌ত্

বহু লোক আছেন যারা ইনশাআল্লাহ উচ্চারণ না করলেও মুখে
তাঁদের প্রাণ সদা যুক্ত ইনশাআল্লাহর প্রাণের সাথে।

যাই হোক ডাক্তারদের অহমিকা ও ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে চিকিৎসায় ফল উলটো হতে লাগল। জ্বর সারার ঔষধে শরীরের তাপমাত্রা আরো বেড়ে যায়। পেটের অসুখে ঔষধ দিলে অবস্থা বেসামাল হয়ে যায়।

মানুষ যখন দেখে যে, হঠাৎ তার জীবনের ছন্দ হারিয়ে গেছে, সবকিছুতে তালগোল পেকে যাচ্ছে, ভালো করতে চাইলে ফল মন্দ হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে, পরিস্থিতি বান্দার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আসমানের ফয়সালা সবকিছু পালটে দিচ্ছে। বান্দা এখন নিরুপায়, অসহায়। আসমানী সাহায্য ছাড়া কোনো গতি নেই। এমন পরিস্থিতিতে কী করা চাই। মাওলানা সে পথ বাতলে দিয়েছেন মসনবীর গল্প-কাহিনীর বাঁকে বাঁকে।

এখানেও দাসীর চিকিৎসায় ব্যর্থতায় বাদশাহর দিব্যচক্ষু খুলে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন আসল গোলমাল অন্যখানে।

شه چو عجز آن حکیمان را بدید
پا برهنه جانب مسجد دوید

শাহ্ চো এজ্‌যে আ'ন হাকীমা'ন রা' বেদীদ
পা' বেরেহ্‌নে জা'নেবে মাসজিদ দওয়ীদ

বাদশাহ যখন ডাক্তারদের অক্ষমতা দেখতে পেলেন
(বিচলিত হয়ে) নাঙ্গা পায়ে মসজিদের পানে দৌড়ে গেলেন।

رفت در مسجد سوی محراب شد
سجده‌گاه از اشک شه پر آب شد

রাফ্‌ত দার মাসজিদ সূয়ে মেহরা'ব শুদ
সাজ্‌দেগাহ্ আয্ আশ্‌কে শাহ্ পুর আ'ব শুদ

মসজিদে সোজা মেহরাবের পানে ছুটে গেলেন
বাদশাহর অশ্রুতে সিজদার জায়গা ভিজে গেল।

বাদশাহ নিজেকে সম্পূর্ণ আল্লাহর কাছে সঁপে দিলেন। তাঁর অশ্রুতে সিজদার জায়গা ভিজে গেল। যখন কান্না থামল মনে হল হুঁশ ফিরে পেয়েছে। মাওলানা এই অবস্থাকে ফানা বা আল্লাহতে বিলীন হওয়ার ঘূর্ণাবর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই অবস্থায় বান্দার মুখে উচ্চারণ থাকে না। থাকে সম্পূর্ণ বিহ্বল অবস্থায়।

چون به خویش آمد ز غرقاب فنا
خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا

চোন বেখীশ্ আ'মাদ যে গ্বারক্বা'বে ফানা'
খোশ যাবা'ন বুগশা'দ দার মদ্‌হ্ ও সানা'

ফানার ঘূর্ণাবর্ত হতে যখন প্রকৃতিস্থ হলেন
আল্লাহর গুণগান প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে দুআ শুরু করতে হয়, বাদশাহ তাই করলেন। আল্লাহর দরবারে আবেদন-নিবেদন, কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগলেন,

کای کمینه بخششت ملک جهان
من چه گویم چون تو می‌دانی نهان

কায় কমীনা বাখশেশাত্ মুল্‌কে জাহা'ন
মন্ চে গুয়াম্ চোন্ তো মী দানী নেহা'ন

ওহে যার ন্যূনতম দান, দুনিয়ার এই রাজত্ব
আমি কী বলব, তুমি তো মনের গোপন কথা জ্ঞাত।

ای همیشه حاجت ما را پناه
بار دیگر ما غلط کردیم راه

এই হামীশে হা'জতে মা'রা' পানা'হ্
বা'রে দীগার মা' গালাত্ কারদীম রা'হ

ওহে! আমার সকল সময়ের সব অভাবের আশ্রয় তুমি
আবারো পথ চিনতে ভুল করে ফেললাম আমি।

আমি ধারণা করেছিলাম, চিকিৎসকেরা আমার দাসীকে রোগমুক্ত করতে পারবে। এখন বুঝতে পেরেছি, একমাত্র তুমিই রোগমুক্ত করতে পার। তুমিই আমার শেষ আশ্রয়, তুমিই আমাকে উদ্ধার কর। আমার মনের সকল কথা, সব প্রয়োজন তোমার জানা। আমি না বললে, না চাইলেও তুমি পূরণ করতে পার। কিন্তু না। তোমার বিধান যে অন্য রকম! বান্দার চাইতে হবে। সব কথা খুলে বলতে হবে। আল্লাহর কাছে দুআ করার এটিই নিয়ম।

لیک گفتی گرچه می‌دانم سرت

زود هم پیدا کنش بر ظاهرت

লে-কে গুফতী গারচে মী দা'নাম সিরাত্
যূ-দ হাম পায়দা' কুনাশ্ বার যা'হেরাত
কিন্তু যে বলেছ, আমি যদিও তোমার ভেদের কথা সবই জানি
(তবুও) জলদি আমার কাছে খুলে বল সব (আমি যেন শুনি)।

আল্লাহ তুমি আমার মনের সবকিছু জান, এ কথা বলে বসে থাকলে হবে না। বরং মনের কথা প্রয়োজনের কথা এক এক করে খুলে বলতে হবে। এই চেতনা থেকে বাদশাহ্ আর্তকান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

چون برآورد از میان جان خروش
اندر آمد بحر بخشایش به جوش

চোন বার আ'ওরাদ আয মিয়া'নে জা'ন খুরুশ
আন্দার আ'মাদ বাহরে বখ্শায়েশ বে জূশ
হৃদয় মথিত কান্না যখন বক্ষ ফেটে উথলে উঠল
রহমতের দরিয়ায় ক্ষমা ও দয়ার জোয়ার আরম্ভ হল।

বান্দা যখন আল্লাহর কাছে অসহায় হয়ে কাঁদে তখন আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোয়ার শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। (সূরা মুমিনূন, আয়াত-৪০)

درمیان گریه خوابش در ربود
دید در خواب او که پیری رو نمود

দারমিয়া'নে গের্য়ে খা'বাশ্ দার রোবূদ
দীদ দার খা'ব উ-কে পীরী রো নামূদ
কান্নার মাঝে তলিয়ে গেলেন অঘোরে ঘুমের কোলে
এমন সময় স্বপ্নে দেখেন, এক বৃদ্ধ তার সম্মুখে।

گفت ای شه مژده حاجاتت رواست
گر غریبی آیدت فردا ز ماست

গোফত এই শাহ্ মুঝদা হা'জা'তাত্ রাওয়া'স্ত
গার গারীবী আ'য়াদাত্ ফারদা' যে মা'স্ত
বললেন, ওহে বাদশাহ! সুসংবাদ, পূরণ হয়েছে তোমার মকসূদ,
কাল কোনো আগন্তুক আসলে জানবেন, তিনি আমার দূত।

خفته بود این خواب دید آگاه شد
گشته مملوک کنیزک شاه شد.

খোফ্তে বূদ ঈন খা'ব দীদ আ'গা'হ শুদ
গাশ্তে মামলূকে কানীযাক শা'হ শুদ
ঘুমন্ত ছিলেন তিনি এ স্বপ্ন দেখে সজাগ হলেন
দাসীর দাস হতে যাচ্ছিলেন, এখন বাদশাহ হলেন।

আল্লাহর দরবারে রুজু হয়ে বিনয়, কাকুতি ও বুকফাটা কান্নার বদৌলতে বাদশাহ এখন প্রকৃত বাদশাহ হয়ে গেলেন। আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ দুনিয়াতে আর কী আছে? প্রথমে দাসীর প্রেমে পড়েছিলেন। এখন তিনি আল্লাহর প্রেমিক। এরপর আর কী চাই।

(মওলানা রূমীর মসনবী শরীফ, ১খ. বয়েত নং-৪১-৬৩)

Al Arab Tailors

মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

আল আরব টেইলার্স

পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট

01734-346601

মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে তুরস্ক

রহমান মুখলেস

দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম বিশ্বে একক প্রভাব ও নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল সৌদি আরব। কিন্তু এখন সৌদির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এগিয়ে আসছে তুরস্ক ও দেশটির নেতা প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে যেখানেই সংকট সেখানেই উচ্চ কণ্ঠে সোচ্চার তুরস্ক এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান। হালফিল আফগানিস্তান পরিস্থিতি থেকে শুরু করে ফিলিস্তিন, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকট, চীনের উইঘুর সংকট এবং ভারতের কাশ্মীরের মুসলিমদের নিয়ে বলতে গেলে একমাত্র উচ্চকন্ঠ তুরস্ক। আর এ ক্ষেত্রে সৌদি আরবের ভূমিকা একেবারেই নিরব দর্শক।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরায়েলের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সবসময়ই সুদৃঢ় অবস্থান তুরস্কের। ইসরায়েল 'অসলো শান্তি চুক্তি' লঙ্ঘন করে স্বাধীন ফিলস্তিন রাষ্ট্রের অবস্থান থেকে শুধু সরেই আসেনি, ফিলিস্তিনি জনগণের শান্তিতে বসবাস এবং শান্তিতে কাজ করার অধিকারও কেড়ে নিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে ইসরায়েল শুধু ওই অঞ্চলের ভবিষ্যতকেই বিপন্ন করে তোলেনি, পুরো বিশ্বকেই আজ বিপন্ন করে তুলেছে। আজ ইসলামী বিশ্বের এই সংকটকালে সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে ঐক্য এ সংহতি। যতদিন মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততদিন সব সমস্যার সমাধানও হবে। আজকে মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ রাখাটাই বড় সংকট।

আজ মুসলিম বিশ্ব নিজেরাই অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিভেদ ও হানাহানিতে লিপ্ত। এক মুসলিম দেশের সঙ্গে আরেক দেশের সংঘাত বেড়েই চলেছে। বেড়ে চলেছে রক্তপাত। চলমান আফগান ইস্যুতেও মুসলিম বিশ্ব এক হতে পারছে না। তুরস্ক, পাকিস্তান, ইরান আফগানিস্তানের নতুন তালেবান সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও অন্যান্য মুসলিম দেশ এ থেকে পিছিয়ে। আর এতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মুসলমান ও মুসলিম বিশ্ব। এমনকি আফগানিস্তানের তালেবান ইস্যুতে মুসলিম বিশ্বের জোট ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ভূমিকাও খুব একটা ইতিবাচক নয়। আফগানিস্তান ছাড়াও নিরন্তর রক্ত ঝরে চলেছে ইয়েমেনে। সাত বছরের গৃহযুদ্ধ ও সৌদি জোটের বিমান হামলায় ইয়েমেন আজ ক্ষত–বিক্ষত। কিন্তু ইয়েমেন সংকট নিরসনেও মুসলিম বিশ্বের যৌথ উদ্যোগ কিংবা ওআইসির কোনো ভূমিকা নেই। মুসলিম বিশ্বে সত্যিই আজ এক ক্রান্তিকাল চলছে। এই ক্রান্তিকালে মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রয়োজন নেতৃত্বের। কিন্তু কে নেবে সেই নেতৃত্ব? কে ধরবে হাল?

আসলে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বে কে?

বিদ্যমান বাস্তবতায় মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের কথা বললে সম্ভাব্য তিনটি দেশের নাম সামনে চলে আসে। সৌদি আরব, ইরান ও তুরস্ক। অনেক দিন ধরেই মুসলিম বিশ্ব সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সংকট উত্তরণে সৌদি আরব প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। নিতে পারেনি নেতৃত্বের আসন। রোহিঙ্গা ইস্যু, আফগানিস্তানের তালেবান ইস্যু, ভারতের কাশ্মীর ইস্যু এবং চীনের উইঘুর মুসলিম ইস্যু ইত্যাদি কোন ইস্যুতেই সৌদি আরবের কোন ভূমিকা নেই। মুসলিম জনগণের এসব প্রতিটি ইস্যুতেই বলতে গেলে সৌদি আরব প্রায় নিরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। অন্যদিকে ইরানের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্কের তিক্ততা মধ্যপ্রাচ্য তো বটেই পুরো মুসলিম বিশ্বকেই প্রভাবিত করেছে। একদা কাতারকে একঘরে করে সৌদি আরব। পরে চলতি বছর কাতারের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়। সৌদির নানা পদক্ষেপ বরং মুসলিম বিশ্বকে আরও দুর্বল করেছে। ইয়েমেনে দিনের পর দিন বোমা ফেলছে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। ইতোমধ্যে দেশটিতে বহু মানুষের প্রাণ গেছে বোমায়। ইয়েমেনে চলছে দুর্ভিক্ষ। জাতিসংঘের তথ্যমতে দেশটি এখন মানবিক বিপর্যয়ের মুখে। কিন্তু তারপরও সৌদি জোট বিমান থেকে ইয়েমেনে বোমা ফেলছেই।

ফিলিস্তিন ইস্যু

ফিলিস্তিনিদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা এবং আজ প্রায় ৭ দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ফিলিস্তিন সংকটের সমাধান হয়নি। দেশহারা ফিলিস্তিনিরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য আজও সংগ্রাম করে চলেছে। একই সঙ্গে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হবে–জাতিসংঘ ও বিশ্ব এই অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু তারা তা রক্ষা করেনি। এমনকি ইসরায়েলের একতরফা আগ্রাসন ও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের কারণে অসলো শান্তি চুক্তিও পুরো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এই সেদিনও ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুসলিম রাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরাতে গিয়ে বললেন, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র কখনই নয়। তারপরও মধ্যপ্রাচ্যের একের পর এক মুসলিম রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে গড়ে তুলছে দহরম– মহরম সম্পর্ক। এমনকি সৌদি আরবও ক্রমেই ঝুঁকছে ইসরায়েলের দিকে। তুরস্ক ছাড়া এখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রই স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নিয়ে আর উচ্চকণ্ঠে সোচ্চার নয়।

ট্রাম্প প্রশাসন আমলে জেরুযালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় বড় এক ধাক্কা। তবে এই সংকটের শুরু থেকেই যথারীতি সোচ্চার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান। বলতে গেলে তিনিই এখন ফিলিস্তিনি তথা সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একমাত্র সোচ্চার কণ্ঠস্বর। তাঁর ভূমিকা ও তৎপরতা মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো ও জনগণের দৃষ্টি কেড়েছে।

তালেবান নিয়ে তুরস্কের পরিকল্পনা

মুসলিম বিশ্বের চলমান সংকট এখন আফগানিস্তান। ২০ বছর পর সেখানে আবার তালেবান ক্ষমতায়। কিন্তু দেশটি এখন চরম আর্থিক সংকট ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখে। কিছুদেশ ও জাতিসংঘ মানবিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এলেও এখনও আন্তর্জাতিক বৈধতা ও স্বীকৃতি মেলেনি। এ অবস্থায় পাকিস্তান ও তুরস্ক জোরালো ভূমিকা রাখলেও তারাও স্বীকৃতি দেয়নি। তবে তুরস্ক ও পাকিস্তান সার্বিক সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত কাভুসোগলুর সঙ্গে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ তালেবানের হাতে যাওয়ার পর পশ্চিমা দেশগুলো সেখান থেকে দূতাবাস সরিয়ে নিলেও তুরস্ক তা করেনি। বরং তুরস্ক অন্য দেশগুলোকে তালেবানের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তাগিদ দিয়ে আসছে। তুরস্ক কাবুল বিমানবন্দরের কারিগরি দিক দেখভালেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে কাতারের সঙ্গে কাজ করছে। অন্যদিকে আফগানিস্তানে সহায়তামূলক কার্যক্রমও চালিয়ে যাবে তুরস্ক।

ইরান প্রসঙ্গ

আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ইরান এখন আলোচিত নাম। মুসলিম বিশ্বের একটি অংশের সাথে ইরানের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ইয়েমেনে সৌদি জোটের হামলার বিরুদ্ধে সেখানে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইরত হুতি বিদ্রোহীদের ইরান সার্বিক সামরিক সহায়তা যোগাচ্ছে। কিন্তু দেশটির পারমাণবিক ইস্যুতে আন্তর্জাতিক অবরোধে ইরান জর্জরিত। দেশটির অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। পশ্চিমা চাপ মুকাবিলার পাশাপাশি আঞ্চলিক প্রতিপক্ষ সৌদি আরবকে সামাল দিতে ইরানকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতায় মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বে আসা এই মুহূর্তে ইরানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ভারতের সাথে সম্পর্কের কারণে কাশ্মীর ইস্যুতেও তেমন সোচ্চার নয় ইরান। একই কারণে চীনের উইঘুর মুসলিম ইস্যুও ইরানের কণ্ঠে উচ্চকিত নয়। এদিকে ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট ইবরাহীম রাইসীও মুসলিম বিশ্বে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। আর মুসলিম বিশ্ব তাঁর নেতৃত্বে আসবে তেমনটি মনেও হয়না। আর রাইসী এখনও ব্যক্তিগত কোন ক্যারিশমাও দেখাতে পারেননি।

রোহিঙ্গা সংকট

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় রোহিঙ্গা সংকটের প্রেক্ষাপটে মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের মধ্যে এরদোয়ানকেই সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকায় দেখা যায়। রোহিঙ্গা সংকটে এরদোয়ানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিন পি স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক তাজ হাশমী এই মত দেন যে, ‘এরদোয়ান তুরস্কের হারানো শৌর্য–বীর্য ফিরিয়ে আনতে চান। একই সঙ্গে তুরস্ককে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তিনি হতে চান মুসলিম বিশ্বের প্রধান নেতা।’

জাতিসংঘের মতে, বিশ্বে বর্তমানে সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর নাম রোহিঙ্গা। আর আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা মেডিসিনস স্যান ফ্রন্টিয়ারসের মতে, পৃথিবী থেকে বিলুপ্তপ্রায় আদিগোষ্ঠীর তালিকায় ভয়াবহ অবস্থানে রয়েছে রোহিঙ্গারা। অথচ আজকের এই নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের রয়েছে গৌরবময় অতীত। রোহিঙ্গাদের স্বাধীন রাজ্য ছিল। রাজ্যের আদি নাম ছিল আরাকান। বর্তমান নাম রাখাইন। আরাকান ছিল বরাবরই স্বাধীন ও অতিশয় সমৃদ্ধ দেশ। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্ভব। কিন্তু মিয়ানমারের সরকার এবং সেনাবাহিনী দেশটির রাখাইন রাজ্যের (আদি নাম আরাকান) রোহিঙ্গাদের বাঙ্গালী নাম দিয়ে এবং তারা মিয়ানমারের নাগরিক নয় এই ফাতওয়া দিয়ে সেখানকার রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। বাংলাদেশে দুই দফায় প্রায় সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করে।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের নিয়ে এক সংকটজনক অবস্থায় আছে। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘ মাঝে মাঝে কথা বললেও সৌদিসহ আরব দেশগুলো এবং ওআইসি একেবারেই নিরব। তবে এরদোয়ান সর্বদাই উচ্চকণ্ঠ।

লিবিয়া সংকট ও তুর্কি সেনার অবস্থান

আজ থেকে একদশক আগে লিবিয়ায় ‘আরব বসন্ত’ নাম দিয়ে বিদ্রোহ উসকে দিয়ে দেশটির জনপ্রিয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে হত্যা করে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে ন্যাটো জোটের সেনারা। দেশটিতে তারা তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু গাদ্দাফির নিহত হওয়ার পর গত এক দশকে লিবিয়ায় কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও গণতন্ত্র ফেরেনি। সরকার এবং বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে লিবিয়া। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিবদমান পক্ষগুলোকে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়, যা গভর্নমেন্ট অব ন্যাশনাল একর্ড (জিএনএ) নামে পরিচিত । পরবর্তিতে ফাইয আল সারাজের নেতৃত্বাধীন জিএনএর সাথে বিরোধে লিপ্ত হয় বিদ্রোহী গ্রুপ খলিফা হাফতারের নেতৃত্বাধীন লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (এলএনএ)। হাফতার বাহিনী লিবিয়ার বেশ কিছু শহর ও অঞ্চল দখলে নেয়। এরপর তুরস্কের সেনারা প্রবেশ করে লিবিয়ায়। জাতিসংঘ সমর্থিত সারাজের নিয়ন্ত্রণাধীন জিএনএ-র সহযোগিতায় এগিয়ে আসে তুরস্কের এই সেনারা। তারা বিপুল পরিমাণে গোলাবারুদ, অত্যাধুনিক ড্রোন আর সিরিয়া থেকে বিদ্রোহীদের এনে হাফতার বাহিনীর ত্রিপোলি অভিযান রুখে দেয়। এরপর আবারও জাতিসংঘের উদ্যোগে গত মার্চে সব পক্ষগুলোকে নিয়ে লিবিয়ায় গঠিত হয় ঐকমত্যের সরকার। সব ঠিক থাকলে আগামী ২৪ ডিসেম্বর লিবিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আর ২০২২ সালের জানুয়ারিতে হবে পার্লামেন্ট নির্বাচন। সন্দেহ নেই লিবিয়া তুরস্কের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তুরস্কের সেনারা এখনও লিবিয়া ছাড়েনি।

সিরিয়ায়ও তুর্কি সেনার অবস্থান

মুসলিম বিশ্বে লিবিয়ার মত সিরিয়াও গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। ইদলিবসহ সিরিয়ার বেশকিছু এলাকা এখনও বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। গণতন্ত্র-মুক্তি-সমৃদ্ধির আশায়, আরব বসন্তের ঢেউ সিরিয়ায়ও আছড়ে পড়েছিল। তারপর শুরু গৃহযুদ্ধের। চলতি বছরের ১৫ মার্চ এই গৃহযুদ্ধের ১০ বছর পূর্ণ হয়। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ সন্ত্রাসীগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) উত্থানে বেশ ভূমিকা রাখে। আইএস ইরাক ও সিরিয়ার একটা বড় অংশ দখল করে ২০১৪ সালের জুনে কথিত ‘খিলাফত’ ঘোষণা করে। বর্তমানে আইএস’র শক্তি প্রায় ক্ষীণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশটিতে অবস্থান রয়েছে বিদেশি শক্তির। বিদ্রোহী ও আইএস অবস্থানে প্রায়ই মার্কিন বাহিনী হামলা চালিয়ে থাকে। সিরিয়ায় মার্কিন সেনার ঘাঁটিও রয়েছে। এছাড়া সিরিয়ায় হামলা চালায় ইসরায়েল, তুরস্ক ও রাশিয়ার মত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তি। ইদলিব হলো সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদ বিরোধী গোষ্ঠীর শক্ত ঘাঁটি। দীর্ঘদিন ধরে ইদলিব সরকারের হাতছাড়া। কুর্দী বিদ্রোহী দমনের নামে ইদলিবে রয়েছে তুরস্কের সেনা ঘাঁটি। তুরস্কের সেনারাও প্রেসিডেন্ট আসাদের সমর্থনে প্রায়ই হামলা চালিয়ে থাকে বিদ্রোহী কুর্দীদের (পিকেকে) দমনে। উল্লেখ্য, তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে মুসলিম কুর্দীরা সেখানে একটি পৃথক কুর্দী রাষ্ট্র গঠনে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে বহু বছর ধরে। সিরিয়া, ইরান ও তুরস্কের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কুর্দী অধ্যুষিত ভূখন্ড। কিন্তু তাদের কোন পৃথক রাষ্ট্র নেই। কুর্দীরাও এক ভাগ্য বিড়ম্বিত জাতি।

এছাড়া আসাদ বিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠী ‘ফ্রি সিরিয়ান আর্মি’র ওপরও হামলা চালিয়ে থাকে তুরস্ক।

বাদশা সালমানের ভূমিকা

সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান সত্যিকার অর্থেই মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। মূলত সৌদির শাসন ব্যবস্থায়ও তাঁর তেমন কোনো ভূমিকা নেই। সৌদি আরবের বাদশা সালমানের নেতৃত্ব নিয়েও আন্তর্জাতিক মহলে ধোঁয়াশা বিরাজ করছে। কার্যত দেশটির শাসনকাজ পরিচালনা করছেন সৌদির যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান। তিনিই দেশ চালাচ্ছেন। আর যুবরাজ এমবিএস মুসলিম বিশ্বের চেয়ে সব ইস্যুতেই যুক্তরাষ্ট্রকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি রাখতেই যুবরাজ ব্যস্ত। এ পরিস্থিতিতে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সামনে সুবর্ণ সুযোগ মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার।

এরদোয়ান ও তুরস্ক

সামরিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ তুরস্ক। তারা সামরিক জোট ন্যাটোরও সদস্য। কিন্তু কামাল আতাতুর্কের আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতির কারণে তুরস্ক সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বে একধরনের অনীহাও রয়েছে। তবে রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান দেশটির ক্ষমতায় আসায় তুরস্ক সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের ভাবমূর্তি পাল্টাতেও শুরু করেছে। এরদোয়ান দীর্ঘদিন ধরে তুরস্কের ক্ষমতায়। প্রথমে ছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী, তারপর এখন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ইসলামপন্থী হিসেবে পরিচিত। তুরস্কে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে কাজ করছেন তিনি। তার আমলেই ইস্তাম্বুলে তুরস্কের বিখ্যাত আয়া সোফিয়াকে আবারো পরিবর্তিত জাদুঘর থেকে মসজিদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। উদ্বোধনের দিন এরদোয়ান নিজে সেই মসজিদে নামায পড়েন। এতে নিজ দেশে এবং মুসলিম বিশ্বে তুরস্কের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো আয়া সোফিয়া শুরুতে গির্জা ছিল। পরে উসমানিয়া সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ ক্রয় করে এটিকে মসজিদে রূপান্তর করেন। কিন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কি নেতা কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমাদের সাথে দেশটির সম্পর্কের উন্নয়ন ও ইসলাম বিদ্বেষী নীতি অবলম্বন করায় সেটিকে আবার গির্জায় রূপান্তর করা হয়। পরে এরদোয়ান সেই আয়া সোফিয়াকে আবারও মসজিদে রূপান্তর করলেন।

এরদোয়ানের জোর প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে মুসলিম বিশ্বে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে আঙ্কারা। বিশেষ করে ২০১৬ সালের ব্যর্থ অভ্যুত্থানচেষ্টার পর তুরস্কে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের অবস্থান আরও সুসংহত হয়েছে। অধিকতর সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তিনি। এমনকি তাঁকে অনেকে তুরস্কের নতুন সুলতান সুলেমান বলেও অভিহিত করেন। তবে এরদোয়ান শুধু নিজ দেশের সুলতান হতে চান না; তাঁর লক্ষ্য আরও বড়। তিনি মুসলিম বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে চান। এই লক্ষ্য থেকেই ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামেও এরদোয়ান নিজের যোগ্যতা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। ২০১৬ সালের এপ্রিলে তুরস্কে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে এরদোয়ান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'আমি সুন্নি বা শিয়া নই, আমার ধর্ম ইসলাম।'

আরব বিশ্বের জনগণ যা চায়

মিশর, সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় অধিকাংশ রাষ্ট্র তুরস্ককে কোণঠাসা করার চেষ্টা করলেও সিংহভাগ আরব জনগণ মনে করছে যে তুরস্কের রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানই তাদের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী। তুরস্ক এবং প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের ব্যাপারে আরব দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে রয়েছে বিপরীত অবস্থান। সম্প্রতি প্রকাশিত আরব বিশ্বের ১৩টি দেশে পরিচালিত আরব জনমতের ওপর একটি ব্যাপক-ভিত্তিক গবেষণা জরিপে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারী আরব জনগণের ৫৮ শতাংশই মনে করেন, অন্য যে কোনো দেশের নীতির তুলনায় তুরস্কের মধ্যপ্রাচ্য নীতি ও এরদোয়ানের ভূমিকা আরব স্বার্থের অনুকূল। ফিলিস্তিন ইস্যু তো বটেই, এমনকি সিরিয়া ও লিবিয়ায় তুরস্কের বিতর্কিত সামরিক হস্তক্ষেপ ও সেনা অবস্থানেও সিংহভাগ আরব জনগণ সমর্থন করছে। উল্লেখ্য, এই জরিপটি পরিচালনা করেছে দোহা ও বৈরুত ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'আরব সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি স্টাডিজ'।

এরদোয়ানের শক্তি প্রদর্শন

এদিকে গত মাসের শেষ দিকে তুরস্কে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রসহ ১০ পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রদূতকে একসঙ্গে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়ে নিজের শক্তিময়তার পরিচয় দিয়েছে তুরস্ক। আর এ ঘোষনা দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। সরকারবিরোধী বিক্ষোভে জড়িত অভিযোগে আটক ব্যবসায়ী ওসমান কাভালার মুক্তির দাবিতে এই রাষ্ট্রদূতরা যৌথ বিবৃতি দিলে রাষ্ট্রদূতদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এই ১০টি দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। গত ১৮ অক্টোবার এক যৌথ বিবৃতিতে কাভালার মুক্তি নিশ্চিত করতে তুরস্কের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন আঙ্কারায় নিযুক্ত এই দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরা। এরপর ২৩ অক্টোবার এরদোয়ানের ঘোষনা। ক্ষোভ প্রকাশ করে এরদোয়ান বলেন, এসব রাষ্ট্রদূতদের তুরস্কে জায়গা দেওয়া উচিত নয়। তাঁর ভাষায়, অন্য দেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এই বিদেশি কূটনীতিকরা দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের পরিচয় দিয়েছেন। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের কাজ নয়।

এরদোয়ানের হুমকিতে কেবল নমনীয়ই নয় বরং নিজেদের অবস্থান থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয় পশ্চিমা ১০ টি দেশ। তারা ভিয়েনা কনভেনশনের ৪১ ধারা মেনে চলতে সম্মত মর্মে যৌথ বিবৃতিতে জানায়। এরদোয়ান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আজকের এই বিবৃতির মাধ্যমে আমাদের বিচার ব্যাবস্থা ও দেশের উপর থেকে অপবাদ অপসারিত হলো, যে ই আমাদের স্বাধীনতাকে অসম্মান করবে সে এই দেশে থাকতে পারবেনা। তার সম্মান যা ই হোক না কেন।'

শেষের কথা

এ কথা শুরুতেই বলেছি, বর্তমান বাস্তবতায় মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের কথা বললে সম্ভাব্য তিনটি দেশের নাম সামনে চলে আসে– সৌদি আরব, ইরান ও তুরস্ক। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তুরস্ক এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানই এগিয়ে রয়েছে। মুসলিম বিশ্ব ও আরব বিশ্ব ছাড়াও আন্তর্জাতিক মহলেও এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত। লন্ডনে রাজনৈতিক ঝুঁকি সম্পর্কিত গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারেস্টের প্রধান এবং মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি বিষয়ক বিশ্লেষক সামি হামদী মনে করেন, তুরস্ক রাষ্ট্রের চেয়ে বরং ব্যক্তি এরদোয়ান সাধারণ আরব জনগণের বিরাট একটি অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছেন, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তিনিই মুসলিম বিশ্বের নেতা।

এদিকে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এরদোয়ানের আগের তুরস্ক আর এরদোয়ান পরবর্তী তুরস্ক অনেক আলাদা। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে আরব জনগণ এখন এটা বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারছেন। তারা জানেন তুরস্কের নতুন যে বৈদেশিক নীতি ও ভূমিকা তার মূলে এরদোয়ান। আর সৌদি আরব ও তার নেতাদের প্রতি আরব জনগণ ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছেন। এদিকে তুরস্ক দেশটির উন্নয়ন ও সামরিক শক্তিও অনেক বাড়িয়েছে। মার্কিন হুমকি উপেক্ষা করে রাশিয়ার কাছ থেকে আরও অস্ত্র কিনছে। একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত বড় বড় শক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে কথা বলছেন এরদোয়ান। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোটকে মোটেই ছাড় দিয়ে কথা বলেন না রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। তাই এ কথা বলা যায়, আগামী দিনে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের সম্ভাবনা তুরস্ক ও তার নেতা এরদোয়ানের দিকেই।

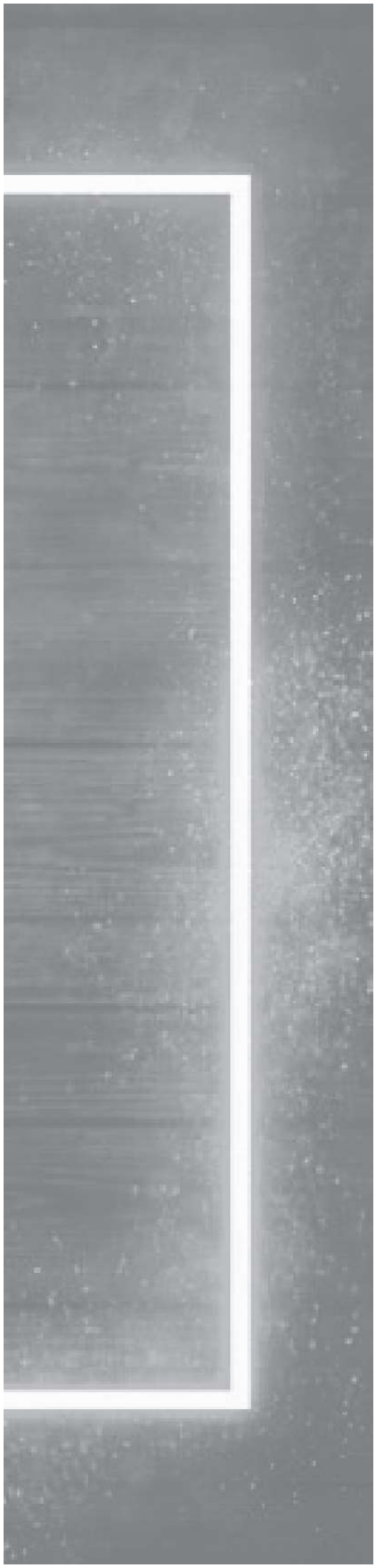

পাশ্চাত্যের নারী চরিত্র নগ্ন বেহায়াপনার আলেখ্য

অধ্যাপিকা হাফিজা খাতুন

বিংশ শতাব্দীর এই প্রান্তে এসে বিশ্ব এমন এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন যা ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে। বিশেষ করে বিশ্বের অনেক দেশে আধুনিকতার নামে নারী-পুরুষের যে অবাধ মেলামেশা আর উশৃঙ্খল নগ্ন বেহায়াপনা চলছে যেকোনো মানুষ তাকে সভ্যতার আচরণ বলবে না। বিশ্বের নগ্ন আধুনিকতা এখন দুটি ভাগে বিভক্ত। এর একটি ভাগ পুরোপুরি নারীদের দখলে। বলা যায়, তারা সভ্যতাকে যে উলঙ্গ করে তাকেই আবার শালীনতা নামক চিত্র-বিচিত্র আসনে তুলে ধরতে তৎপর হয়ে উঠেছে। তাদের এই অপকর্ম একটি অপতৎপরতায় পরিণত হয়েছে। আর অপর ভাগটি রয়েছে বস্তুবাদীদের দখলে। তারা তাদের স্বার্থে নারীদের পণ্য বানিয়ে ব্যবহার করছে। এটা তাদের এক ধরনের চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ড।

ইসলাম পুরুষ এবং নারীকে সমান অধিকার প্রদান করেছে এবং উভয়কে তার নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থাকতে বারবার আদেশ দিয়েছে। প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট গণ্ডি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ পারিবারিক নিয়ম-কানুন, সামাজিক বিধি-নিষেধ সর্বোপরি পোশাক পরিচ্ছদে শালীনতা ও পর্দাপ্রথা মেনে চলাসহ আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপে কঠোর নিয়মের তাগিদ দেওয়া হয়েছে– যা ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে সুন্দরভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে। আমরা বর্তমানে সেটাই বিভিন্ন দেশে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। আরব রাষ্ট্রগুলোসহ ইসলামী রাষ্ট্রই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অথচ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে আমাদের লজ্জা আর ঘৃণায় চোখ বন্ধ হয়ে আসে। আমরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হই। তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ আর নগ্ন পোশাকে বেহায়াপনা এতটাই তীব্র এবং উশৃঙ্খল যে এদেরকে সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় আদি যুগের বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো লজ্জাহীন মানুষের মতো মনে হয়।

একথা আজ নিঃসন্দেহে সত্য, পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদের করতলে। তারা সংস্কৃতির নামে আধুনিক ধারায় যেভাবে নাচছে, গাইছে, বিনোদনে মেতে থাকছে তাতে গোটা দেশ তাদের নৈতিক চরিত্র হারাতে বসেছে। বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায় আজ তাদের নেশার খোরাকে পরিণত হচ্ছে।

আজ পাশ্চাত্যে অধঃপতন সর্বনিম্ন স্তরে চলে গেছে পোশাকের অশালীনতায়। নামেমাত্র পোশাক গায়ে জড়িয়ে রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতে নারীরা অবাধে বিচরণ করছে। সব দেখে মনে হয়, এটা তাদের ঐতিহ্যগত ধারা। যুবসমাজ আজ তাদের ভারে আক্রান্ত। পোশাকের চেয়ে দেহ প্রদর্শনই তাদের মূখ্য বিষয়। তাদের কাছে আধুনিকতা মানেই নগ্নতা। এককথায়, নিজেকে আকর্ষণীয় এবং খ্যাত করে তোলার প্রথম শর্ত হচ্ছে, নগ্নতাকে অবলীলায় বেছে নেওয়া। সেই সাথে অবাধে নারী পুরুষ উঠা-বসা থেকে যেকোনো অপকর্ম করা এটা তাদের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরনের নতুন নতুন ঘাতক ব্যাধি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমকামিতা একটি সামাজিক-স্বীকৃত আচার যা শুনলে লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। বুদ্ধি-বিবেকবান আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষ কিভাবে এ ধরনের হীন-বিকৃত রুচি অবলম্বন করে, ভাবাই যায় না।

বর্তমান বিশ্বে যতগুলো মুসলিম দেশ আছে তার অধিকাংশই এদের নগ্ন প্রভাবের করাল থাবা থেকে মুক্ত হতে পারছে না। বরং দিনদিন এদেরকে অনুসরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর কয়েকটি প্রধান কারণ রয়েছে। যেমন- ১. ইসলাম ধর্মের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, ২. উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি তাদের প্রভাব বিস্তার, ৩. দেশের নারী-পুরুষদের প্রতি আকর্ষণীয় যৌনতা প্রদর্শন।

এ আলোচনা প্রসঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির প্রয়াসও তুলে ধরা যেতে পারে। অনেকে বলেন, আজকের নারী সমাজের পশ্চাৎপদতার পেছনে ভক্তিবাদ মানসিকতা চরমভাবে ক্রিয়াশীল। ইহজাগতিক সাফল্য ও প্রগতির জন্য দরকার ভক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। পুরুষ যেহেতু শক্তিমান, তাই ইসলাম নারীকে করে দিয়েছে পুরুষের অনুগত। অর্থাৎ তাকে পুরুষদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে সবসময়ের জন্য। আর এ পথেই সামাজিক নিরাপত্তা ও আখিরাতের মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। এজন্য নারীর উন্নয়ন ও স্বাধিকারের জন্য ধর্মকে পরিহার করতে হবে এবং ইসলামের দেখানো পথকে শুধু পরিহার নয় উচ্ছেদ করতে হবে। এই অপকৌশলের সূত্র ধরে নারীবাদ আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ইসলাম বিরোধী প্রচারণা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নারীদের সংগঠিত করা, সোচ্চার ও উচ্চকণ্ঠের আশ্রয় নেয়া। কারণ, তারা বুঝেছে এ কাজে সফলকাম হতে হলে অন্য কোনোভাবে এগুনো সম্ভব নয়। তারা আরো ধুয়া তোলে যে, হাদীসে আছে, মহিলারা পুরুষদের অর্ধাংশ। এভাবে তারা বুঝাতে চায়, ইসলাম নারীকে পূর্ণ অধিকার দেয়নি। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বেলায়ও এ ধরনের যুক্তি-তর্কের অবতারণা তারা করে থাকে।

যারা বস্তুবাদী, ভোগবাদী এবং নারীপণ্য ব্যবসায়ী তারা ইসলামকে এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝানোর চেষ্টা চালায়। আর তাদের ফাঁদে পা দেয় সাধারণ লোকেরা। বিশেষ করে নারী সমাজের একটি বিরাট অংশ আজ তাদেরকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে মদদ যোগাচ্ছে।

শুধু এটা করেই তারা চুপ থাকছে না। তারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বইপুস্তকে, ম্যাগাজিনে, মিছিল-মিটিংয়ে ও সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে এসব ধর্মীয় অসংলগ্ন অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি অভিযোগ উত্থাপন করছে ইসলামের বিরুদ্ধে। তাদের এ ধরনের সাড়ম্বর নেটওয়ার্ক দেখে মনে হয়, নারীর মর্যাদা ও মুক্তি তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামকে বিতর্কিত করে তোলা। এ সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষের সূত্রপাত ঘটানো।

তাদের ধারণা, ইসলামই নাকি নারীদের পেছনে ফেলে রেখেছে। ইসলাম নারীকে ঘরকুনো করে সংসার আবদ্ধ রাখতে চায়, আর তাই পৃথিবীতে নারীরা পুরুষদের চেয়ে এক শতাব্দীকাল সময় পেছনে পড়ে রয়েছে।

বিশ্বের সকল দেশের মহিলা প্রতিনিধিদের নিয়ে গত কয়েক বছর আগে চীনের বেইজিং-এ নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বিশ্বের প্রথম সারির নারী নেতৃবৃন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, আমরা সমান অধিকার চাই, পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, আমরা আর পুরুষদের অধীনে থাকতে চাই না। চাকুরি থেকে শুরু করে সব জায়গায় সমান পদের অধিকার চাই।

এ নিয়ে এ যাবতকাল প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। প্রতিবাদ হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার কর্তব্য এবং দায়িত্ব বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন। অথচ নারী বলছে, তার উলটো কথা। তারা চলছে তাদের উগ্র-চেতনা নিয়ে। তারা রাজপথ ছাড়বে না, ধর্মের বলয় থেকে তারা মুক্তি চায়। আর এজন্য বিশ্বের সকল নারীকে একত্রিত হতে তারা আহ্বান জানিয়েছে।

প্রথমে যেকথা আলোচনা শুরু করেছিলাম সে প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। পাশ্চাত্যে বিনোদনমূলক যত গণমাধ্যম আছে তার সবখানেই নারীদের সরব উপস্থিতি। শুধু তাই নয় বিনোদনের সকল ক্ষেত্রেই নারীদের আধিপত্য পুরুষদের চেয়ে বরং বেশি। মদের টেবিলে, পার্কে, হোটেলে, বিমানে, স্কুলে সবখানেই নারীরা তাদের অশালীন পোশাকে কাজকর্ম করে যাচ্ছে। তাদের যে নিজস্ব ধর্মবোধ তাও তাদের মধ্য থেকে লোপ পেয়ে গেছে। পুরুষ-নারী কলেজে, হোটেলে, পার্কে সর্বত্র অবাধে মেলামেশা করছে।

বিবাহ বন্ধন একটি সামাজিক এবং ধর্মীয় রেওয়াজ। এর পরিবর্তে পাশ্চাত্যে চলছে লিভিং টুগেদার। তাদের এই লিভিং টুগেদার এর মাধ্যমে অনেক সন্তান-সন্ততিরও জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় কোনো স্বীকৃতি তাদের প্রয়োজন পড়ছে না। ফলে তাদের মধ্যে বয়সের মাঝপথে গিয়ে বিচ্ছেদ-কলহ প্রভৃতি চরমে উঠছে। অনেক সময় খুন-রাহাজানি, গুম ইত্যাদি নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। গোটা সমাজে বিশৃঙ্খলা নেমে আসছে।

এক জরিপে দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ বছর বয়সী শতকরা প্রায় ৯৫ জন নারী অসতী। আর যারা চাকুরিজীবী এদের মধ্যে সৎ বা সতী কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তারা তাদের পরিচয় গোপন রাখে। কারণ সৎ বা সতী পরিচয় তাদের সমাজে একটা লজ্জাজনক ব্যাপার। সে সকলের কাছে হাস্যকর বলে বিবেচিত।

এরপরেও তাদের আন্দোলন থেমে থাকছে না। এখন চলছে মিটিং, মিছিল, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার প্রভৃতি। তারা আরো স্বাধীনতা চায়। তাদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা- আর নয় পুরুষ, আমরাই সব। নারীকুলে জন্ম হয়েও আমার ভাবতে অবাক লাগে- এরা আসলে কী চায়! এদের স্বাধীনতার আসল স্বরূপটা কী!

এক ডিভোর্সি বোনের খোলাচিঠি

জানিনা, আমি কেন লিখছি। হয়তো এজন্য, কারণ আমি চাই আর কেউ আমার মতো ভুল না করুক। হয়তো এজন্য, কারণ আমি চাই ঠুনকো কারণে সংসারগুলো ভেঙে না পড়ুক। আমি তেত্রিশ বছর বয়সী একজন নারী। আমাদের বিয়ে হয়েছিল দুই পরিবারের সম্মতিতে। সংসারও টিকেছিল অনেকগুলো বছর। আমাদের একটা মেয়েও আছে, ওর বয়স ৮ বছর। আমার স্বামীর স্বভাব-চরিত্র সবই বেশ ভালোই ছিল। শুধু একটু বদমেজাজি। অবশ্য তাও সবসময় না, মাঝেমধ্যে। মানুষ ভাবে ওর বদ রাগের জন্যই বুঝি আজ এই অবস্থা, কিন্তু আমি জানি, আমাদের সমস্যার শুরুটা ওর দিক থেকে হয় নি।

সব সংসারেই তো টুকটাক কিছু সমস্যা থাকে। ওরকম আমাদের মধ্যেও মাঝেমাঝে ঝগড়া-ঝাটি হতো। কিন্তু ঝগড়া বাধলেই আমি তল্পিতল্পা গুছিয়ে বাপের বাড়ির দিকে হাঁটা দিতাম। বাপের বাড়িতে বোনরাও আসতো, আর ভাইরা তো ছিলই। ওদের কাছে কেঁদেকেটে সব বলতাম। তখন সবাই ওকে ফোন করে কথা শোনাত। আমার মেজো বোনতো রীতিমত অপমান করত!

আমার কাছেও মনে হতো, ঠিকই আছে। কত বড় সাহস, আমার সাথে লাগতে আসে। আমাকে নিজের মতো চালাতে চায়। আমার মধ্যে কেমন একটা জেদ কাজ করতো। ওর কাছে ছোট হব, ওর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করব, মাফ চাইব, এটা ভাবতেই পারতাম না। উল্টো বড় গলা করে বলতাম, "ডিভোর্স দাও! তোমার মতো লোকের সাথে কে সংসার করে? নাহ, ডিভোর্স আমি কখনোই মন থেকে চাই নি। ওটা ছিল মুখের কথা। ওর সামনে ছোট হওয়ার চাইতে ডিভোর্স চাওয়াটাই আমার কাছে সঠিক মনে হতো।

একদিনের কথা এখনও মনে পড়ে। সেদিন ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে তর্ক করতে করতে দুজনেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। রাগে আমার শরীর কাঁপছে। যা মুখে আসছে তাই বলছি। তুই-তোকারি, গালিগালাজ, অপমান কিচ্ছু বাদ যায় নি। এক পর্যায়ে সে ধৈর্যের বাধ ভেঙে আমার গায়ে হাত তুললো! এর আগে কিংবা পরে কখনোই ও আমার গায়ে হাত তুলে নি। কিন্তু ঐ একটা থাপ্পড়, ওটাই যথেষ্ট ছিল।

আমি বাপের বাড়ি চলে গেলাম। আর হ্যাঁ বরাবরের মতো এবারও নিজের দিকটা না বলে খালি ওর দিকটাই বলে গেলাম। মানুষের দোষ দিয়ে আর কী লাভ! সবাইকে যা বলেছি, সেটার উপর ভিত্তি করেই তারা বিচার করেছে। পরিবারের সবাই বললো, এমন ছেলের সাথে সংসার করার কোনো দরকার নাই। মামলা ঠুকে দাও।

আমি সবার পরামর্শে মামলা করলাম। ওর নামে নারী নির্যাতনের কেইস করা হল। খুব দ্রুতই ওকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। ওর পরিবার থেকে মুরুব্বিরা এসে বার বার অনুরোধ করল, আমি যেন এই কেইস তুলে নিই।

ভেতরে ভেতরে আমিও চিন্তা করতাম, আচ্ছা, আমার স্বামী কি আসলেই যালিম? ও কি কোনদিন নিজে থেকে আমার গায়ে হাত তুলেছে? আমি যদি ওকে এত কথা না শোনাতাম, তাহলে কি ও আমার গায়ে সেদিন হাত তুলতো?

আমার ভাইবোন আমাকে বুঝিয়েছিল, আমি যদি এতকিছুর পর ফিরে যাই, তাহলে ও ভাববে, আমি বুঝি অসহায়। আমার উপর ইচ্ছেমতো ছড়ি ঘুরাবে। একবার গায়ে হাত তুলেছে মানে বার বার একই কাজ করবে। কাজেই নিজ থেকে ফিরে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমার মনের ভেতর কে যেন চিৎকার করে বলতো, ও তো এমন লোক না। ও যেদিন আমার গায়ে হাত তুলেছিল, সেদিনই হাটু জোড় হয়ে আমার কাছে মাফ চেয়েছে। এসব ভেবে ভেবে আমি মামলা তুলে নিলাম। তবে ওর কাছে ফেরত গেলাম না।

কিছুদিন পর দুই পরিবার থেকে বিচার-সালিশ হল। সবার কাছে ও দোষী প্রমাণিত হল। সবাই ওকে নানা কথা বোঝাল, উপদেশ দিল। তারপর আবার সংসার শুরু করলাম।

এর পরের কয়েক বছর ভালোই চলছিল, কিন্তু হুট করে আবার কী একটা নিয়ে আমাদের ঝগড়া বেধে গেল। ব্যস, কাপড়চোপড় গুছিয়ে আবার আমি বাপের বাড়ি গিয়ে উঠলাম। এর মধ্যে শুনলাম ও নাকি খুব অসুস্থ ! আমি বাসায় ফিরতে চাইলে আমার পরিবার বললো, এভাবে একটা ঝগড়ার পর একা একা ফিরলে সেটা ভালো দেখায় না। আর আমার বোনদের কথা ছিল, ওসব অসুস্থ-টসুস্থ কিছু না, সব বাহানা!

আমরা চাচ্ছিলাম ঐ পক্ষ থেকে কিছু আত্মীয়-স্বজন এসে ওর ভুল স্বীকার করে আমাকে হাতেপায়ে ধরে নিয়ে যাক। কিন্তু এবার কেউই আসলো না। এরও কিছুদিন পর ও আমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিল। ডিভোর্স লেটার দেখে আমাদের পরিবারের সবাই খুব খেপে গেল। কতবড় সাহস, মেয়েকে এত কষ্টে রেখেছে, তার উপর ডিভোর্স লেটার পাঠায়। সবার কথায় আমার কাছেও মনে হলো, ঠিকই তো, কত বড় সাহস! আমাকে ডিভোর্স দিতে চায়? ওর সব ভুলগুলো চোখের উপর ভাসতে লাগলো। ভাই মনে করিয়ে দিলো, ও হলো সেই ছেলে যে কিনা আমার গায়েও হাত তুলেছে। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে আমিও ঠিক করলাম, এবার ডিভোর্সই দেব। কে চায় এমন ফালতু লোকের সংসার করতে? কোর্টে গিয়েও ওকে হেনস্থা করার চেষ্টা করলাম। আমার মাসিক খরচ বাড়িয়ে একটা আকাশছোঁয়া অংক দাবি করলাম! আমি চাচ্ছিলাম ওর যেন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। যেন নিজে থেকে আমার কাছে এসে আবার সংসার করতে চায়। আসলে ডিভোর্স হোক আমি কখনোই চাই নি। কিন্তু জেদ আমাকে খেয়ে নিচ্ছিল। আগ বাড়িয়ে ওকে ডিভোর্স তুলে নিতে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব! ওর কাছে ছোট হওয়া আমি মানতেই পারি নি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ও আমার আকাশছোঁয়া সমস্ত দাবি মেনে নিলো। আমাদের মেয়েকে আমি পেয়ে গেলাম। ভরণপোষণ, মাসিক খরচ, ওর সম্পত্তি সব! বিনিময়ে ও পেলো শুধু ডিভোর্স।

আমাদের ডিভোর্স হয়েছে আজ সাড়ে তিন বছর। ও আবারও বিয়ে করেছে। দুই ছেলের বাবা হয়েছে। সুখেই আছে বোঝা যায়। আসলে ওর মতো নির্ঝঞ্ঝাট স্বামীকে নিয়ে মেয়েরা হয়তো সুখেই থাকবে। এখন আমার নিজের কথা ভেবে আফসোস হয়। মানুষের মুখের কথা কখনো কখনো ছুরির চেয়েও ধারালো হতে পারে। ও আমাকে একবার থাপ্পড় মেরেছিল ঠিকই, কিন্তু আমি কথার তীরে ওকে ছিন্নবিন্ন করে ফেলতাম। শারীরিক নির্যাতন করি নি সত্যি, কিন্তু মানসিকভাবে কষ্ট দিতাম। এসব কথা আমার ভাইবোনকে কখনোই বলা হয় নি। নিজের দোষের কথা মানুষ কতটাই বা বলে! মাঝে মাঝে ভাবি, ইশ, আমার পরিবার যদি একটু নিজ থেকে বুঝে আমাকে সংসার করার উপদেশ দিতো। যখন আমি ওর কাছে ফিরে যেতে চাইতাম, তখন ওর খারাপটা না বলে যদি একটু ভালো দিকগুলোর কথা মনে করাতো! আমি যদি নিজের জেদ নিয়ে পড়ে না থেকে একটু ওর কাছে নত হতাম! তাহলে হয়তো আজ আমাকে এই দিন দেখা লাগতো না।

আজ আমার ভাইবোন বন্ধুবান্ধব সবার নিজেদের সংসার আছে। কিন্তু তেত্রিশ বছর ডিভোর্সিকে সন্তানসহ মেনে নেয়ার মতো কোনো ভালোমানুষ নেই। নিজের হাতে আমি নিজের সংসারটা ধ্বংস করেছি। তাই আজ বলতে চাই,বোনেরা!তোমরা আমার মতো ভুল করো না। কার থেকে উপদেশ নিচ্ছো একটু ভেবে নিও। সংসারের সব কথা সবাইকে বলতে নেই, আর মানুষের সব কথা শুনতে নেই। কেউ জানেনা চার দেয়ালের ভেতর আসলেই কী হয়েছিল। মানুষের নযরে নিজের স্বামীকে ছোট করতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মেরো না। জেদ করতে গিয়ে নিজের ভুলের উপর পড়ে থেকো না। পস্তাবে তুমিই, আর কেউ না।

[ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত, কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত ও সম্পাদিত, সূত্র-ইন্টারনেট]

এই মাসে এই চাঁদে

মুহাম্মদ নিবরাস উল্লাহ

ইয়াকুব সাফফার শীরাজ নগরী জয় করেন

খলীফা মামুনের আমলে তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি তাহের ইবন হুসাইনকে তিনি হিজরী ২০৫ সালে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাহের স্বাধীনবাবে খোরাসান শাসন করতেন, ক্রমে খোরাসানের শাসন ক্ষমতা তাহেরের বংশধরগণের হাতে চলে যায়। এই পরিবার বনী আব্বাসের সমর্থক ছিল। কিন্তু তুর্কীদের প্রভাব বিস্তার করার ফলে কেন্দ্রীয় খিলাফ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পূর্বাঞ্চলে তিনটি শক্তির উদ্ভব হলে বনী তাহেরও দুর্বল হয়ে যায়। এই শক্তিত্রয় ছিল জাইদিয়া, সাফফারিয়া ও সামানিয়া। সাফফারিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইয়াকুব ইবন লাইস ও তাঁর ভাই আমর ইবন লাইস, তাঁরা দুইজনে মিলে সিস্তানে সাফফারিয়া রাষ্ট্র কায়িম করেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় বাল্যকালে পিতলের কাজ করতেন বলে তাদেরকে সাফফার বলা হয়। সে সময় সিস্তানে সালেহ ইবন নজর কেনানী নামক এক বুযুর্গ সাধক বাস করতেন, তিনি ছিলেন যুদ্ধরত একটি দলের নেতা। ইয়াকুব ও আমর এই সাধকের সংশ্রবে থাকেন এবং তাঁরই প্রভাবে এই ভ্রাতৃদ্বয়ও পরহেযগার মুত্তাকী হয়ে উঠেন, উক্ত সাধকও তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন বিশেষত ইয়াকুব ছিলেন তাঁর অতিপ্রিয় পাত্র। সালেহ ইবন নজর কেনানীর ইন্তিকালের পর দিরহাম ইবন হুসাইন মুজাহেদীন দলের নেতা মনোনীত হন এবং এই দল কর্তৃক ইয়াকুবকে সমর নায়ক করা হয়। ইয়াকুবের প্রতিভা ও যোগ্যতা দেখে দলের পক্ষ হতে তাকেই নেতা মনোনীত করা হয় এবং দিরহামকে বরখাস্ত করা হয়। ইয়াকুব খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। অতঃপর হিজরী ২৫৩ সালে ইয়াকুব সিস্তান ও হিরাত অধিকার করেন। ক্রমে তিনি বিজয় অভিযান পরিচালনা করে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে থাকেন। এই সময় খলীফা ছিলেন মোতাজ। ইয়াকুব পারস্যের ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্যে খলীফার দরবারে নানা প্রকারের মূল্যবান ও আকর্ষণীয় উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন এবং দূতগণের পৌঁছার সাথে সাথে ইয়াকুবও পারস্যের দিকে যাত্রা করেন। আলী ইবন হুসাইন প্রতিরোধকল্পে শীরাজের আশপাশে পরিখা খনন করেন, ইয়াকুবও সেখানে পৌঁছেন এবং উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধের পর ইয়াকুব জয়লাভ করেন এবং আলীকে গ্রেফতার করেন। জুমুআর দিন ইয়াকুব শীরাজের মসজিদে খলীফা নিযুক্ত করত ইয়াকুব কিরমান হয়ে সিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন।

হিজরী ২৫৫ সালের ১৯ রবিউস সানী ইয়াকুব ইবন লাইস সাফফার শীরাজ নগরী জয় করেন।

বিখ্যাত সাধক শাইখ আমান পানিপথীর ইন্তিকাল

সূফী বা সাধক তত্ত্বের ইতিহাসে বহু 'মাশরাব', 'মাসলাক' 'তরীকা' ইত্যাদি নামে যেসব পরিভাষা প্রচলিত এগুলোকে এককথায় সূফী মতবাদ বলা যেতে পারে। এসব 'তরীকা' বা মতবাদেরও নানা শাখা-প্রশাখা রয়েছে। প্রধান তরীকাগুলো হচ্ছে- চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, কাদিরিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া ও মুহাম্মাদিয়া।

অপ্রধান তরীকাগুলোর মধ্যে ওয়ায়েসী, মাদারী, শাত্তারী, কলন্দরী, মালামাতী প্রভৃতি। বাংলাদেশসহ পাক ভারত ছাড়াও সুদূর ইরান, আফগানিস্তান, আরব-তুরস্ক পর্যন্ত এবং পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন দেশে উল্লেখিত প্রধান অপ্রধানসহ আরো নানা তরীকা শাখা কমবেশি প্রচলিত। সূফী সাধক, আউলিয়ায়ে কিরাম ও সাধারণ ভক্ত মুতাকিদ ও মুরীদগণ এসব তরীকা ও শাখার সাথে কোনো না কোনো রকমে জড়িত। আবার কোনো কোনো সাধক একাধিক তরীকা কিংবা শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখানে আমরা এমন এক সাধকের কথা উল্লেখ করছি যিনি প্রধান তরীকা হিসেবে কলন্দরিয়া ও মালামাতিয়া তরীকাদ্বয়ের অনুসারী ছিলেন এবং আরও বহু 'সিলসিলা' বা ধারা সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই সাধকের প্রকৃত নাম আবদুল মালিক এবং উপাধি আমানুল্লাহ; তিনি শাইখ আমান পানিপথী নামে অধিক পরিচিত। হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর পিতা হযরত শাইখ সাইফুদ্দীন (র.) এর পীর ও মুরশিদ ছিলেন হযরত শাইখ আমান পানিপথী। কলন্দরিয়া তরীকায় দুটি ধারায় (সিলসিলায়) তিনি বিখ্যাত সাধক হযরত শাহ নিআমাতুল্লাহ অলী (র.) এর সাথে যুক্ত ছিলেন। কয়েকজন শাহ নিআমাতুল্লাহ এর মধ্যে এই শাহ নিআমাতুল্লাহ অলী (র.) এর জীবনকাল ১৩২৯ হতে ১৪২৪/৮২৭ হিজরী বলে জানা যায়। মতান্তরে তাঁর ইন্তিকাল হয় ১৪৩১ সালে। শাইখ আমান পানিপথী ছিলেন হযরত শাইখ হাসান তাহেরের পুত্র শাইখ মুহাম্মদ হাসান (র.) এর মুরীদ এবং শাইখ মুহাম্মদ মওদুদ লারী (র.) এর শাগরিদ। তাছাড়া ছিলেন শাইখ ইবনুল আরবী এর মতবাদেরও অনুসারী।

তিনি সূফী উলামার মধ্যে তাওহীদ সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী হওয়ায় তাঁকে তাওহীদবাদী সূফী বলা হয়। তিনি বলতেন, প্রথমে তাওহীদ সম্পর্কে মাত্র দুটি দলীল জানা ছিল এবং আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি তাওহীদ ও সূফী শাস্ত্রে তিনি বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর একটি পুস্তিকার নাম 'ইসবাতুল আহদিয়ায়' বা আল্লাহর একত্বে প্রমাণ। তিনি মাওলানা আবদুর রহমান জামী (র.) এর 'লাওয়ায়েহ' নামক পুস্তকের বিশদ ব্যাখ্যা পুস্তক রচনা করেন।

হযরত শাইখ আমান (র.) বলতেন, আমার নিকট দরবেশীর সম্পদ দুটি 'তাহযীবুল আখলাক বা চরিত্র সুন্দর করে গড়া এবং হযরত রাসূলে করীম ﷺ এর পরিবারবর্গের প্রতি ভালোবাসা।' তাঁর মজলিসে দুনিয়াবী আলাপ-আলোচনা, বেহুদা কথাবার্তা এবং কারো গীবত বা পরনিন্দা করার অনুমতি ছিল না। তিনি আল্লাহর যিকর ও জ্ঞান প্রসারে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন এবং সূফী শাস্ত্রের উপর রচিত কিতাবাদি অত্যন্ত মনোযোগ ও গভীর আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন এবং শিক্ষা প্রদান করতেন। তিনি এ সম্পর্কে বলতেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোনো জিনিসের সন্তুষ্টি প্রদান করা হয়েছে, আমাদের সন্তুষ্টি সূফীদের রচনাবলির মধ্যে। কোনো ভক্ত যদি তাঁর কাছে আসত, তখন তাকে তিনি পড়তে বলতেন এবং এটাই ছিল তার নিয়ম। এ কারণে তাঁর কাছে সাধারণ লোকের ভিড় কম হতো। তাঁর কোনো খানকাহ আস্তানাও ছিল না। তিনি ছাত্রদেরকে 'ইশক' বা বাহ্যিক প্রেম করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন যে, এ কাজে লিপ্ত হওয়া 'মুবতাদী'কে আসল কাজ থেকে বিরত রাখে। তিনি আরাম আয়েসের সামগ্রী এবং পানাহারের কোনো বস্তুই তাঁর কাছে রাখতেন না।

হযরত শাইখ আমান পানিপথী (র.) এর ভক্ত অনুসারীদের সংখ্যা কম নয়। তিনি কাদিরিয়া তরীকার সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। হিজরী ৯৫৭/১৫৫০ ১২ রবিউস সানীতে ইন্তিকাল করেন।

মুসলিম ইবন উকবা মদীনা আক্রমণ করে

কারবালার ময়দানে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের মর্মান্তিক ঘটনার পর মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইয়াযীদের এই বর্বরতা ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বিশেষত হিজাযে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত ইয়াযীদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের খবর পেয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) মক্কাবাসীদের এক জনসভায় এক আবেগময় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি ইরাকবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করেন। এই বক্তৃতা শ্রবণ করে লোকেরা তাঁর প্রতি এতই মুগ্ধ হয়ে পড়ে যে, তাঁকেই তারা খলীফা মনোনীত করার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং উপস্থিত সবাই তাঁর হাতে খিলাফতের বাইআত করে।

ইয়াযীদ প্রথম থেকে হযরত ইবন যুবাইর (রা.) সম্পর্কে আশঙ্কা করে আসছিল, তাঁর প্রতি মক্কাবাসীদের সমর্থন ও তাঁকে খলীফা হিসেবে বরণ করার খবর পেয়ে দারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং সে কতিপয় ব্যক্তিকে এই নির্দেশ দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করে যে, ইবন যুবাইরকে তারা প্রথমে ইয়াযীদের বাইআতের জন্য আহ্বান জানাবে, অস্বীকার করলে তাকে গ্রেফতার করে মক্কায় নিয়ে আসবে। ইবন যুবাইর ইয়াযীদের নির্দেশ শুনে বলেন যে, তিনি তাঁর কোনো কথা মানতে প্রস্তুত নন।

ইয়াযীদ মুসলিম ইবন উকবার নেতৃত্বে বার হাজার মিসরীয় সৈন্য মদীনাবাসীদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করে মুসলিম মদীনার নেতৃবর্গকে ডেকে বলে, তিন দিনের সময় দেওয়া হলো, এই সময়ে তারা বিদ্রোহ হতে বিরত না হলে পরিস্থিতি ভালো হবে না। মদীনাবাসীরা মুসলিমের হুমকির পরোয়া না করে তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। মুসলিম তাদের উপর আক্রমণ করলে তাদেরকে পরাজিত করে এবং মদীনাতুর রাসূলে গণহত্যার নির্দেশ দেয়।

'হাররা' নামক স্থানের দিক থেকে মুসলিম ইবন উকবা মদীনা আক্রমণ করেছিল বলে এটাকে হাররা আক্রমণ বলা হয়। হাররার এই ঘটনা হিজরী ৬৩/৬৮২ সালের ১ আগস্ট সংঘটিত হয়। অর্থাৎ মুসলিম ইবন উকবা এই তারিখে মদীনা আক্রমণ করে।

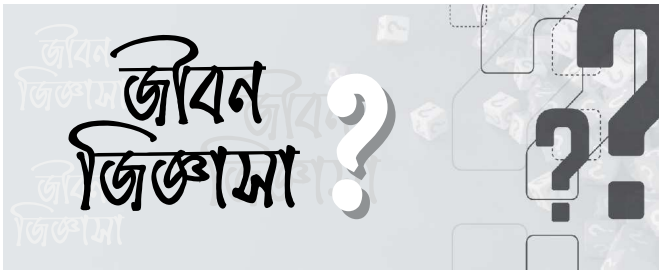

জবাব দিচ্ছেন-

মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার

প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা।

খলিলুর রহমান

দক্ষিণ ছাতারপই ইবতেদায়ি মাদরাসা
ছাতক, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন-১: ঈদের নামাযে তিন তাকবীর দেওয়ার পর সানা না কি চতুর্থ তাকবীরের পর সানা পড়তে হয়? এর সঠিক নিয়ম জানতে চাই।

প্রশ্ন-২: ঋণ করে কুরবানী ও যাকাত দেওয়া যাবে কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাব-১: ঈদের নামাযে প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমাহ বলে হাত বেঁধে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার আগেই সানা পড়তে হয়। এরপরে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলে তৃতীয় তাকবীরে হাত বেধে তার পর নিরবে تعوذ (আউযুবিল্লাহ..) ও تسميه (বিসমিল্লাহ···) পড়ে সুরা ফাতিহা ও কিরাত পড়তে হয়। এ সম্পর্কে 'নূরুল ঈদাহ' কিতাবে লিখেছেন:

وكيفية صلاتها أن ينوي صلاة العيد ثم يكبر للتحريمة ثم يقرأ الثناء ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منها ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة

-ঈদের নামায নিম্নোক্ত ধারাবাহিকতায় আদায় করবে: ১) ঈদের নামায আদায়ের নিয়ত করবে, অতঃপর ২) তাকবীরে তাহরীমা বলবে, অতঃপর ৩) সানা পড়বে, অতঃপর ৪) অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে এবং প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাবে, অতঃপর ৫) আউযুবিল্লাহ ··· ও বিসমিল্লাহ ··· নিরবে পড়ে ফাতিহা ও সূরা মিলাবে। (নূরুল ঈদাহ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৭)

বাদাইয়ুস সানাওয়ী কিতাবে লিখেছেন:

يصلي الإمام ركعتين: فيكبر تكبيرة الافتتاح، ثم يستفتح فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره عند عامة العلماء، وعند ابن أبي ليلى يأتي بالثناء بعد التكبيرات وهذا غير سديد

-ইমাম দুরাকআত নামায আদায়ে প্রথমে তাকবীরে তাহরীমাহ বলবেন, অতঃপর সানা পড়বেন, অধিকাংশ আলিমগণের নির্ভরযোগ্য অভিমত। (বাদাইয়ুস সানাওয়ী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৭)

জবাব-২: কুরবানী সামর্থবান এমন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যিনি কুরবানীর দিনসমূহে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। অবশ্য উক্ত সম্পদ তার নিত্য প্রয়োজনীয় মালের অতিরিক্ত হবে এবং ঋণমুক্ত হবে। তদ্রুপ যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে নিসাব পরিমাণ মাল ঋণমুক্ত অবস্থায় পূর্ণ একটি বৎসর অতিক্রম করা শর্ত। সুতরাং যারা ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে বর্তমানে উক্ত নিসাব পরিমাণ মালের মালিক নন, তাদের উপর কুরবানী ও যাকাত অপরিহার্য নয়। কারো উপর কুরবানী ওয়াজিব না হলে সে নফল কুরবানী করতে পারে। তদ্রুপ কারো উপর যাকাত ফরয না হলেও সে নফল সাদকাহ করার ইখতিয়ার আছে। তা নগদ অর্থ থেকে করুক বা কারো নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে করুক।

বাদাইয়ুস সানায়ী কিতাবে লিখেছেন:

ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا

-যাকাত ফরয হওয়ার আরেকটি শর্ত হচ্ছে: যাকাতদাতার উপর এমন কোন ঋণ না থাকা যা কোনো বান্দাহর হক হিসেবে পরিশোধযোগ্য। যদি এরূপ ঋণ থাকে, তাহলে সে ঋণের সম পরিমাণ মালে যাকাত ওয়াজিব নয়। চাই তা তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য কিংবা বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণ হোক না কেন। অর্থাৎ নিসাব হিসাব করতে উক্ত ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ নিসাবের সমান কিংবা অধিক হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। (বাদাইয়ুস সানাওয়ী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬)

মোট কথা, কারো উপর কুরবানী ওয়াজিব হলে এবং নগদ অর্থ হাতে না থাকলে ঋণ করে কুরবানী আদায় করলেও তা আদায় হবে। যার উপর যাকাত ফরয সে নগদ অর্থ থেকে উক্ত যাকাত আদায় করা উত্তম। নগদ অর্থ না থাকলে ঋণ করে যাকাত আদায় করলে অনুত্তম হলেও যাকাত আদায় হবে। নফল কুরবানী ঋণ করে আদায় করা অনুত্তম। তবে আদায় করলে কুরবানী আদায়ের সাওয়াব হবে। তদ্রুপ নফল-দান খয়রাত ঋণ করেও করা যায় এবং তাতে সাওয়াব রয়েছে।

মাহবুব আহমদ

কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: আমরা জানি কোনো মুমিন মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির মুখ কিবলামুখী করে কবরে রাখা হয়, কিন্তু আমাদের এলাকায় কিছু লোক একজন মুফতীর মতানুসারে কবরের মাঝখানে আরও একটি নালা করে সমস্ত শরীরকে কিবলামুখী করে রাখেন। এ বিষয়ে সঠিক পদ্ধতি কোনটি জানতে চাই।

জবাব: মৃত ব্যক্তির লাশ কবরে রাখার ব্যাপারে ইসলামী শরীআহ এর নির্দেশনা অনুযায়ী সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে- কিবলামুখী করে ডান পার্শ্বের উপর রাখা। এর জন্য প্রয়োজনে নরম মাটি কিংবা বালু মায়্যিতের পিঠের দিকে ঠেস দিয়ে রেখে হলেও তাকে ডান পার্শ্বে কাত করে সমাহিত করা সুন্নাত। পিঠের উপর চিত করে রেখে মৃতের মুখ কিবলামুখী করে রাখার যে পদ্ধতি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত, তা অপক্ষাকৃত সহজতর হওয়াতে এর উপর সর্বসাধারণের আমল চলে আসছে। তাই এ নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি না করাই কাম্য। তবে সুন্নাতের উপর আমল করাই উত্তম। এ সম্পর্কে 'আল হিদায়াহ' গ্রন্থে লিখেছেন:

إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في القبر لأنه أشرف عليه والمختار في بلادنا الاستلقاء لأنه أيسر لخروج الروح والأول هو السنة– الهداية : ١/٨٨

-কোন লোক মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছলে তাকে ডান পার্শ্বের উপর কিবলামুখী করে রাখা চাই, যা কবরে রাখার অবস্থার সাথে সামঞ্জশ্যপূর্ণ। ইহাই তার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি। অবশ্য আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে- চিত করে রাখা, কেননা এ পদ্ধতিতে রূহ বের হওয়া সহজতর। তবে প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী আমাল করা সুন্নাত। (আল হিদায়াহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮)

'আল মুহীতুল বুরহানী' কিতাবে লিখেছেন:

ويوضع في القبر على شقه الأيمن موجها إلى القبلة قال عليه السلام: يا علي استقبل به القبلة استقبالا وضعوه لجنبه ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه على ظهره

-মৃত ব্যক্তিকে কবরে কিবলামুখী করে ডান পার্শ্বের উপর রাখা হবে।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে আলী! মায়্যিতকে কিবলামুখী করে রাখ, বাহুর উপর রাখ, উপুড় করে রাখবে না এবং চিত করে রাখবে না। (আল মুহীতুল বুরহানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯১)

এ সম্পর্কে 'তুহফাতুল ফুকাহা' কিতাবে লিখেছেন:

ومنها الإضجاع في اللحد والسنة فيه أن يضجع على شقه الأيمن ووجهه نحو القبلة

-কবরে লাশ রাখার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে- ডান পার্শ্বের উপর এমন ভাবে রাখা হবে যে, মুখ কিবলামুখী থাকবে। (তুহফাতুল ফুকাহা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯১)

মোটকথা, সুন্নাত পদ্ধতির আমলের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে খাল খননের প্রয়োজন নেই। উল্লেখিত মুফতী ছাহেব কর্তৃক বাড়তি এ কর্মের কারণেই হয়তো ফিতনার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে, যা অযাচিত।

কাওছার আহমদ
বড়লেখা, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত ফরয হজ্জ করা যাবে কি?

জবাব: যদি পিতা-মাতা উক্ত সন্তানের প্রতি প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সমাধার ক্ষেত্রে মুখাপেক্ষি বা নির্ভরশীল না হন, তাহলে সন্তানের জন্যে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত হজ্জ আদায় জায়িয। অন্যতায় জায়িয নয়। এ সম্পর্কে 'রাদ্দুল মুহতার' কিতাবে লিখেছেন:

قوله وله الخروج إلخ أي إن لم يخف على والديه الضيعة بأن كانا موسرين، ولم تكن نفقتهما عليه. وفي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس، وإلا فلا يسعه الخروج

-জ্ঞানার্জনে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত সন্তানের বাইরে যাওয়া জায়িয- ইহা তখন প্রযোজ্য হবে যখন সন্তান তার পিতা-মাতার কোন ক্ষতির আশংকা করবে না, যেমন তারা স্বচ্ছল থাকবে এবং উক্ত সন্তানের রোজগারের উপর তাদের ভরন-পোষণ নির্ভরশীল হবে না। আর 'খানিয়াহ' কিতাবে রয়েছে- যদি সন্তান হজ্জে যেতে চায় এবং তার পিতা তা অপছন্দ করেন, আর উক্ত পিতা যদি সে সন্তানের সেবা নেয়ার মুখাপেক্ষী না হন, তাহলে তার জন্যে হজ্জে যেতে কোন অসুবিধা নেই। অন্যথায় তার হজ্জে যাওয়ার (বৈধতা) সুযোগ নেই। (রাদ্দুল মুহতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৮)

'আদ দুররুল মুখতার' কিতাবে লিখেছেন:

وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه لو ملتحيا

-সন্তান দ্বীনী জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত বের হতে পারবে যদি শ্মশ্রুমন্ডিত (বয়স্ক ও ফিতনামুক্ত) হয়। (আদ দুররুল মুখতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৫)

ফয়েজ আহমদ
বিশ্বনাথ, সিলেট

প্রশ্ন: স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে চুল ও দাঁড়িতে কালো রংয়ের খেযাব ব্যবহার করা জায়িয আছে কি?

জবাব: চুল ও দাঁড়িতে কালো রংয়ের খেযাব ব্যবহার ইসলামী শরীআহ শুধু মুসলিম যুদ্ধাদের জন্যে বৈধ হওয়ার বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে। তবে কেউ এরূপ খেযাব স্ত্রীর মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে, তা ফকীহগণের নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র.) মাকরূহ ব্যতীত ইহাকে জায়িয বলেছেন।

এসম্পর্কে 'ফাতাওয়া শামী' কিতাবে লিখেছেন:

قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها

-যখীরাহ কিতাবের মধ্যে রয়েছে-যুদ্ধাবস্থায় শত্রু সেনাদের নিকট অধিক ভীতি সৃষ্টির জন্যে মুজাহিদের জন্যে কালো রংয়ের খেযাব ব্যবহার সর্বসম্মতভাবে প্রশংসনীয়। আর কেউ নিজেকে স্ত্রীর নিকট সুসজ্জিত করার নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরূহ হবে। ইহাই অধিকাংশ মাশায়িখের অভিমত। অবশ্য কেউ কেউ একে মাকরূহ ব্যতীত বৈধ বলেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর বৈধতায় বলেছেন, আমার নিকট স্ত্রীর সৌন্দর্য প্রদর্শন যেমন আনন্দদায়ক তদ্রুপ তার সম্মুখে আমার সৌন্দর্য প্রদর্শন ও আনন্দদায়ক। (রাদ্দুল মুহতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২২)

'আল মুহীতুল বুরহানী' কিতাবে লিখেছেন:

وأما الخضاب بالسواد: فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ، ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء، وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه عليه عامة المشايخ

-কালো খেজাব ব্যবহার: কোন যুদ্ধা যদি শত্রু পক্ষের চোখে নিজেকে ভীতিকর হিসেবে প্রদর্শন করতে কালো খেজাব ব্যবহার করে তাহলে আলিমদের সর্বসম্মতিতে তা জায়িয। আর যদি স্ত্রীর কাছে নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে তাহলে মাকরূহ। এটাই অধিকাংশ আলিমদের অভিমত। (আল মুহীতুল বুরহানী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

কামরুল ইসলাম
বালাগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন: বর্তমানে চুল কাটার ক্ষেত্রে বিজাতীয় একটি পদ্ধতির প্রচলন আমাদের সমাজে তথা (মুসলমান) যুবক ছেলেদের মধ্যে বেড়ে গেছে। মাথার তিনদিক এমন ছোট করে কাটা হয় যা সেইভের মতো মনে হয় এবং অসামঞ্জস্য করে উপরিভাগ লম্বা রাখা হয়। ইহা জায়িয কি?

জবাব: আচার-আচরণ, চলা-ফেরা ও সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে বিজাতীয় অনুকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে এসেছে:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف

-রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যারা অন্য জাতির অনুকরণ করে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। তাই তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের অনুকরণ করো না। কেননা ইয়াহুদীর সালাম আঙ্গুলের দ্বারা, আর নাসারাদের সালাম হাতলী ব্যবহার করে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৯৫)

উপরোক্ত হাদীস শরীফে বর্ণিত 'অন্য জাতির অনুকরণের নিষেধাজ্ঞা' ব্যাপকার্থে হওয়ার কারণে আচার-আচরণের সকল বিষয়াদি উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হওয়াতে উক্ত নিয়মে চুল কাটা উচিত নয়। এরূপ চুল কাটার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال: احلقوا كله، أو اتركوا كله

-রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শিশুকে কিছু চুল মুন্ডন করা হয়েছে এবং বাকী চুল রেখে দেওয়া হয়েছে দেখে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, হয়তো তোমরা পূর্ণ মাথার চুল কাটবে নতুবা পূর্ণ মাথার চুল রেখে দেবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৫৬১৫)

সুতরাং উপরোক্ত নিয়মে চুল কাটা পরিহার করা উচিত।

ফাহমিদা বেগম
জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

প্রশ্ন-১: নারীদের জন্য নামাযের সময় পা ফাঁকা রাখার হুকুম কী? কতটুকু ফাঁকা রাখা যাবে? জানালে উপকৃত হব।

প্রশ্ন-২: এলকোহল মিশ্রিত পারফিউম ব্যবহার করে নামায আদায় করলে নামায হবে কি?

জবাব-১: নারীরা নামাযে ক্বিয়াম ও রুকুর সময় দু পা ফাঁকা না রেখে মিলিয়ে রাখা উত্তম, যেহেতু ইহা তাদের পর্দা রক্ষার ক্ষেত্রে অধিক সহায়ক। মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবা কিতাবে বর্ণিত হাদীস শরীফে এসেছে-

عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال: تجتمع وتحتفر

-হযরত ইবন আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং ২৭৭৮)

সুনানে বাইহাকী কিতাবে বর্ণিত হাদীস শরীফে এসেছে-

عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: «إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل»

-তাবিঈ ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব (র.) বলেন, একবার রাসূল ﷺ দুই নামায আদায়রত মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্য) বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মত নয়। (আল মারাসিল লি আবী দাউদ, হাদীস নং ৮৭; সুনানে বাইহাকী, হাদীস নং ৩২০১; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, হাদীস নং ৪০৫৪)

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে হানাফী ফুকাহাগণ মহিলাদের নামাযে দাঁড়ানোর পদ্ধতিতে পুরুষের চেয়ে কম ফাঁকা রাখা পর্দা রক্ষার অধিক সহায়ক হওয়ার কারণে উত্তম বলে রায় দিয়েছেন।

জবাব-২: এলকোহল পাক কিংবা নাপাক হওয়া এর প্রস্তুত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। যেসব এলকোহল খেজুর বা আঙ্গুর দ্বারা তৈরি করা হয়নি, সেগুলো মৌলিকভাবে নাপাক নয় এবং যতটুকু ব্যবহারে নেশার উদ্রেক হয় না ততটুকু ব্যবহার জায়িয। ইহাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর অভিমত। (ফাতহুল কাদীর, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬০; আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১২; আল বাহরুর রাইক, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮; তানভীরুল আবসার মা'আদ দুররিল মুখতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৯)

বর্তমানকালের প্রসাধনি যেমন- সেন্ট, পারফিউম, বডি স্প্রেগুলোতে আঙুর, খেজুর বা কিসমিস থেকে প্রস্তুতকৃত এ্যালকোহল থাকে না; বরং বিভিন্ন শস্যদানা, গাছপালার ছাল, ভাত, মধু, শস্য, যব, আনারসের রস, গন্ধক ও সালফেট এবং অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদি থেকে প্রস্তুতকৃত এ্যালকোহল মেশানো হয়। তাই এরূপ পারফিউম নাপাক নয় এবং এ জাতীয় পারফিউম ব্যবহার করে নামায আদায় করা বৈধ।
তবে এগুলো বর্জন করে এলকোহল মুক্ত আতর কিংবা পরিচ্ছন্ন সুগন্ধি ব্যবহার উত্তম ও অধিক তাকওয়ার পরিচায়ক।

জুলহাস আহমদ চৌধুরী
মোকামবাজার, রাজনগর, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: তিনধাপ বিশিষ্ট মিম্বরে খুৎবা প্রদানকালে খতীব কোন ধাপে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন এবং কোন ধাপে বসবেন? জানালে উপকৃত হব।

জবাব: খুৎবাহ প্রদানকালে ইমাম মিম্বরের যে কোন ধাপে বসতে পারবেন এবং এর যে কোন ধাপে বসা সুন্নাত পরিপন্থি নয়। মিম্বরের উপরের ধাপে বসা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কর্ম পন্থা। (উপর থেকে) ২য় ধাপে বসা হযরত আবূ বকর (রা.) এর কর্ম পন্থা। ৩য় ধাপে বসা হযরত উমর (রা.) এর আমল ও কর্ম পন্থা। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.) সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উপরের দিক থেকে ১ম সিঁড়িতে বসে ২য় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দেওয়া শুরু করেন।

তারীখুল খামিস কিতাবে লিখেছেন:

وليحيى عن ابن أبي الزناد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المجلس ويضع رجليه على الدرجة الثانية فلما ولى أبو بكر قام على الدرجة الثانية ووضع رجليه على الدرجة السفلى فلما ولى عمر قام على الدرجة السفلى ووضع رجليه على الارض فلما ولى عثمان فعل ذلك ست سنين من خلافته ثم علا الى موضع النبي صلى الله عليه وسلم

-রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে বসার স্থানে (সর্বোচ্চ স্তরে) বসে দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখতেন। হযরত আবূ বকর (রা.) খলীফা হওয়ার পর দ্বিতীয় সিঁড়িতে বসে নিচের সিঁড়িতে পা রাখতেন। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) খিলাফতপ্রাপ্ত হলে সর্বনিম্নের সিঁড়িতে বসতেন ও মাটিতে পা রাখতেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) খিলাফতপ্রাপ্ত হলে প্রথম দিকে ছয় বছর অনুরূপ করেছেন, তারপর (পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায়) নবী করীম ﷺ এর বসার স্থানে উন্নীত হয়েছিলেন। (তারীখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮)

সুতরাং খতীব সাহেব তার সুবিধামতো মিম্বরের যে কোন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতে পারবেন।

বশির আহমদ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: স্বশব্দে বা উচ্চ স্বরে যিকর করার বিধান জানতে চাই। যিকর উচ্চস্বরে করা উত্তম না কি নিরবে করা উত্তম?

জবাব: উচ্চ স্বরে বা স্বশব্দে যিকর করা স্থানভেদে বৈধ ও স্থানভেদে অবৈধ। যদি উচ্চ স্বরে যিকর করার মধ্যে লৌকিকতা তথা রিয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে উচ্চ স্বরে যিকর নাজায়িয। তদ্রুপ কোন নামাযরত ব্যক্তির নিকট বসে উচ্চ স্বরে যিকর করা অবৈধ, যেহেতু ইহা তার নামায সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে প্রতিবন্ধক। তাছাড়া ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশে বসে উচ্চশব্দে যিকর করা অবৈধ, কেননা ইহা তার নিদ্রায় বিপত্তির কারণ। অন্যথায় যে সকল স্থানে উচ্চস্বরে যিকরের মধ্যে কোন বিপত্তির কারণ নেই বরং উপকার রয়েছে সেসব স্থানে তা জায়িয ও উত্তম। এ সম্পর্কে ফাতাওয়ায়ে শামী কিতাবে লিখেছেন:

والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر، لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط اهـ ملخصا

-উচ্চস্বরে ও নিরবে যিকরের মধ্যে উত্তম হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসের বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানে এরূপ বলা সমীচীন হবে যে, ব্যক্তি ও অবস্থার বিচারে এর বিধান ভিন্ন হবে। তাই যেখানে স্ব শব্দে যিকরে রিয়া (লৌকিকতা) বা কারো নামাযে ব্যাঘাত বা ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হবে, সেখানে নিরবে যিকর উত্তম। আর যেখানে এসকল বিষয়ের আশংকা থেকে মুক্ত হবে সেখানে স্বশব্দে যিকর উত্তম। কেননা এতে অধিক কার্যকারিতা, শ্রোতার উপকারিতা, যিকরকারীর অন্তরকে জাগ্রত করে তার মনকে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন করা ও তার কর্ণকে এর আওয়াজ শ্রবণে ব্যবহার করা, ঘুম দূর হওয়া এবং মনের প্রফুল্লতা ও আগ্রহ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। (রাদ্দুল মুহতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৮)

জুবায়ের আহমদ
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: কনুই খোলা রেখে নামায আদায় কি মাকরুহ? হাজীদের ক্ষেত্রে ইহরাম অবস্থায় কি তা মাকরুহ হবে?

জবাব: কনুই খোলা অবস্থায় নামায আদায় মাকরূহ। তবে ইহরামের অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে সেটা মাকরূহ নয়। কেননা সাধারণ অবস্থার চেয়ে ইহরামের অবস্থার বিধান বহু ক্ষেত্রে ভিন্ন। যেমন ইহরামের অবস্থায় পুরুষের জন্যে মাথা ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ তদ্রুপ সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ যা অন্য সময়ে উত্তম ও অধিক সাওয়াবের কাজ। এ সম্পর্কে রাদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন:

وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين. وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما

(১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪০)

খুলাসাহ ও মুনিয়াহ কিতাবে কনুই পর্যন্ত অনাবৃত থাকা মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট যে, কনুই থেকে কম অনাবৃত থাকলে মাকরূহ হবে না।

এসম্পর্কে 'আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ' কিতাবে লিখেছেন:

ولو صلى رافعا كميه إلى المرفقين كره

-যদি কেউ কনুই পর্যন্ত হাত অনাবৃত রেখে নামায আদায় করে, তাহলে সেটা মাকরূহ হবে। (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৬)

হাফিজ মোশাররফ হোসাইন

প্রশ্ন-১: ইমাম সাহেবের কয়টি দোষ পেলে ইমামতি বাতিল?

প্রশ্ন-২: বিবাহের মোহরানা কী পরিমাণ হওয়া বাঞ্চনীয়? স্বর্ণ দেওয়া জরুরি কি? ফাতেমী মোহরের পরিমাণ কত? দলীলসহ জানতে চাই।

জবাব-১: ইমামের জন্যে ইমামতির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় যোগ্যতা থাকা এবং প্রকাশ্য পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। এতে ব্যতিক্রম হলে স্বভাবত: ফিতনা সৃষ্টির পথ তৈরী হয়। তাই আবশ্যকীয় যোগ্যতার কমতি থাকলে যেমন- কিরাত শুদ্ধ না থাকলে কিংবা জরুরি মাসআলা জানা না থাকলে অথবা ইমাম প্রকাশ্য পাপাচারিতায় লিপ্ত হলে, যেমন- বেপর্দা, বেহায়াপনা, ব্যভিচার ইত্যাদিতে লিপ্ত হলে কিংবা অন্য যে কোন গোনাহে কবীরাহ বা হারাম কার্যে জড়িত হলে ইমামকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কমিটি কর্তৃক পদচ্যুত করা যাবে। তাছাড়া কোন ইমামের উপর অধিকাংশ মুসল্লির অনাস্থা এসে গেলে কমিটি কর্তৃক বিদায় দেওয়ার পূর্বেই ইমাম নিজে বিদায় নেয়া উচিত। যেহেতু হাদীস শরীফের কোন কোন বর্ণনায় উক্ত ইমামের নামায কবূল না হওয়ার বিষয় এবং কোন কোন বর্ণনায় এমন ইমামের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত করেছেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। সুনানে তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে:

عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب

(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৮)

জবাব-২ : মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো দশ দিরহাম। (দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা বা ৩০.৬১৮ গ্রাম রূপা)

যেমন হাদীসে এসেছে-

عن الشعبي، قال: قال علي: لا مهر بأقل من عشرة دراهم

-শাবী থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, দশ দিরহামের কম পরিমাণে কোন মোহর নেই। (মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং ১৬৩৭৪)

মোহরের সর্বোচ্চ কোন সীমা শরীআত কর্তৃক ধার্য করা হয়নি। তাই স্বামীর মতামত নিয়ে তার আদায়ের সামর্থ রয়েছে, এমন যেকোন পরিমাণ উভয়পক্ষের সমঝোতায় ধার্য করা যেতে পারে।

বিবাহে স্বর্ণ দেওয়া জরুরি নয়। তবে মোহরানা নগদ অর্থ কিংবা স্বর্ণ-রৌপ্য, জায়গা-জমি যেকোন কিছু দিয়ে আদায় করা যাবে। মোহরের বাইরে উপহার হিসেবে স্বর্ণ দেওয়াও জায়িয রয়েছে।

পরিমাণের দিক থেকে উত্তম মোহর হচ্ছে সে পরিমাণ মোহর যা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় স্ত্রীগণের জন্য এবং আপন কন্যাগণের জন্যে ধার্য করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা.) এর মোহর (মোহরে ফাতিমী) ছিল পাঁচশত দিরহাম। যেমন, মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (র.) বর্ণনা করেন,

كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم

(মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং ১৬৩৭৩; পরিচ্ছেদ: প্রাগুক্ত; তাবাকাতে ইবন সাদ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২)

মহরে ফাতেমী হলো, ৫০০ দিরহাম, যা বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ১৩১.২৫৩ তোলা (প্রায় ১৩১ভরি ৩ মাশা) বা ১.৫৩০৯ কিলোগ্রাম রূপা। (এক দিরহামের ওজন হল ৩.০৬১৮ গ্রাম)

রূপার বর্তমান বাজার মূল্য যত টাকা ভরি হবে, সেটা দিয়ে ১৩১.২৫৩কে গুণ দিলে মহরে ফাতেমীর হিসাব টাকায় বেরিয়ে আসবে।

উদাহরণস্বরূপ, রুপার বর্তমান বাজার মূল্য ভরি প্রতি ১০০০ টাকা, তাহলে মহরে ফাতেমী আসবে- ১৩১.২৫৩×১০০০৳ = ১,৩১,২৫৪টাকা। (জাদীদ ফিকহী মাসআলা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৩; জাওয়াহিরুল ফিকাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৪)

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

"ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন। ???

জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে

প্রশ্ন করুন

প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

অফিস: বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

অভ্যন্তরীণ

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দেশে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালিত

পরওয়ানা ডেস্ক:

এ বছর দেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। গত ২০ অক্টোবর বুধবার সরকারি ছুটি ঘোষণা করে সরকার। ঐদিন দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি ভবন ও অফিস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিদেশি কূটনৈতিক মিশন ও দূতাবাসগুলোতেও জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

সরকারী উদ্যোগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৫ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে দেশের সকল ধারার আলিম-উলামা বক্তব্য রাখেন।

দিনটি উপলক্ষে বেসরকারীভাবেও বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মসজিদ, মাদরাসা, মাযার ও খানেকা শরীফগুলোতে আলিম-উলামাসহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মাহফিল ও র‍্যালিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন। বিশেষ করে সিলেটে বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ ও তালামীযে ইসলামিয়া ব্যাপক কর্মসূচি পালন করেছে। গত ১৯ অক্টোবর মঙ্গলবার,বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার উদ্যোগে আধ্যাত্মিক রাজধানী পুণ্যভূমি সিলেট নগরীতে হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় 'মুবারক র‍্যালি'। র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য সকাল থেকেই সোবহানীঘাটস্থ হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা জমায়েত হন। সকাল ১১টা থেকে যুহরের পূর্ব পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী ও অতিথিবৃন্দ। বাদ যোহর শুরু হয় র‍্যালি। প্রিয়নবীর শানে রচিত কালজয়ী নানা কবিতার শ্লোক অঙ্কিত রঙ-বেরঙের ফেস্টুন ও প্লেকার্ড র‍্যালিতে শোভাবর্ধন করে। আশিকে রাসূল ছাত্রজনতার সুরে সুরে ধ্বনিত হয় প্রিয়নবীর প্রশংসাগীতি। র‍্যালিপূর্ব আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত। তার সার্বজনীন শান্তির বার্তা দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এদিকে ঐদিন বাদ আসর থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর উদ্যোগে সোবহানীঘাটস্থ হাজী নওয়াব আলী জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে মাহফিলে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুষ্ঠিত হয়েছে।এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আল্লামা মুফতী গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী।

এছাড়াও (২০ অক্টোবর) মঙ্গলবার, ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী নারিন্দা মশুরীখোলা দরবার শরীফের পীর ছাহেব আলহাজ মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহছানুজ্জামানের নেতৃত্বে সকালে দরবার শরীফ থেকে জশনে জুলুস বের করা হয়। ঢাকা হাইকোর্ট মাযার মসজিদে মসজিদ ও মাযার প্রশাসন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। মাহফিলে দুআ পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও হাইকোর্ট জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী।

চট্টগ্রামের আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিভাগীয় শহরে জসনে জুলুস বের করা হয়।

তাছাড়াও দেশের প্রায় প্রতিটি বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সদরে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

ফেব্রুয়ারিতে হচ্ছে না ২০২২ সালের এসএসসি পরীক্ষা: শিক্ষামন্ত্রী

২০২২ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ফেব্রুয়ারিতে হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। গত ২৭ অক্টোবর সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এ তথ্য জানান।

দীপু মনি বলেন, এবারের এসএসসি পরীক্ষা শেষ হবে ২৩ নভেম্বর, আর এইচএসসি শেষ হবে ৩০ ডিসেম্বর। সে ক্ষেত্রে ১ ফেব্রুয়ারি আবার পরীক্ষা (এসএসসি) নেওয়া সম্ভব হবে না। তাদের (আগামী বছরের পরীক্ষার্থী) ক্লাস করার বিষয়ও রয়েছে। কাজেই তাদের আরেকটু সময় দিয়ে তারপর পরীক্ষা হবে। কবে কীভাবে কোন পাঠ্যসূচিতে হবে,এগুলো পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সাধারণত প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির শুরুতে এসএসসি ও সমমান এবং এপ্রিলের শুরুতে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা হতো। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে পুরো শিক্ষাপঞ্জি এলোমেলো হওয়ায় তা সম্ভব হচ্ছেনা।

এ বছরও জেএসসি, জেডিসি, পিইসি ও ইইসি পরীক্ষা হচ্ছে না

চলতি বছর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা হচ্ছে না। তবে তাদের মূল্যায়ন হবে শ্রেণিতে—এমনটাই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। গত ২৭ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এমন তথ্য জানান।

এদিকে এ বছরও প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হচ্ছে না বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে নির্দেশনা চেয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সারসংক্ষেপ পাঠিয়েছিল, সেটি অনুমোদন হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছেন।

কুরআন অবমাননায় দেশ জুড়ে প্রতিবাদ ও নিন্দা

ইসলামী নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

কুমিল্লার নানুয়ার দিঘীরপাড় পূজামন্ডপে গত ১২ অক্টোবর রাতে পবিত্র কুরআন অবমাননার ঘটনায় দেশ জুড়ে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বিবৃতি, নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান বিভিন্ন ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন,দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআনের অবমাননা করা হয়েছে। যা মুসলমানদের হৃদয়ে চরমভাবে আঘাত হেনেছে। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ: পবিত্র কুরআন অবমাননাকারীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী ও মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা এ কে এম মনোওর আলী। এক যৌথ বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, কুরআন শরীফ মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এর বিন্দুমাত্র অবমাননা কোনো মুসলমান সহ্য করতে পারে না। হিন্দুদের পূজামণ্ডপে দেবীর পায়ে কুরআন রাখা নিঃসন্দেহে কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। এর সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন: বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীন ও মহাসচিব অধ্যক্ষ শাব্বীর আহমদ মোমতাজী দেশে চলমান ধর্মীয় সংকট নিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন,সম্প্রতি কুমিল্লার একটি মন্দিরে মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফ রাখাকে কেন্দ্রকরে দেশের সর্বত্র অস্থিরতা বিরাজমান। যারা ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট ও দেশকে অশান্ত করার জন্য এধরণের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে কিংবা এ ঘটনার সাথে জড়িত সকলকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। নেতৃবৃন্দ সরকার ও প্রসাশনের প্রতি এ উদাত্ত আহবান জানান।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মহাসচিব প্রিন্সিপাল হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ ও যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান কুমিল্লার নানুয়ার দিঘীরপাড় পূজামন্ডপে মূর্তির পায়ের নিচে পবিত্র কুরআন রেখে অবমাননা করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা অবিলম্বে পূজামন্ডপে পবিত্র কুরআন অবমাননাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ: কুমিল্লায় পূজামন্ডপে পবিত্র কুরআন অবমাননার প্রতিবাদ জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর আমীর মাওলানা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব মাওলানা নুরুল ইসলাম। এক বিবৃতিতে হেফাজত নেতারা বলেন, কুমিল্লায় পূজামন্ডপে পবিত্র কুরআনকে যেভাবে অবমাননা করা হয়েছে, তা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। যারা বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চায়,তাদের বিরুদ্ধে অতিসত্বর কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস: কুমিল্লায় পবিত্র কুরআন অবমাননার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়েছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর মাওলানা ইসমাঈল নূরপুরী ও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মাওলানা আব্দুল আজিজ।

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি: কুমিল্লায় আল কুরআন অবমাননার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন: বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জী ও মহাসচিব মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী এক যুক্ত বিবৃতিতে কুমিল্লায় পূজামন্ডবে কুরআন অবমাননার তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তালামীযে ইসলামিয়া: বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ দুলাল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক মুজতবা হাসান চৌধুরী নুমান এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, পবিত্র কুরআনের অবমাননায় প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা এ ঘৃণিত কাজের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে দোষীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবী জানান।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে

বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২১-এ ১১৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৬তম। সূচকে মোট ১০০ স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ১৯ দশমিক ১। সূচকে প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

গত ১৪ অক্টোবর বিশ্ব ক্ষুধা সূচক (জিএইচআই) ২০২১ প্রকাশিত হয়। কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও ওয়েল্ট হাঙ্গার হিলফে যৌথভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। জিএইচআইয়ের ওয়েবসাইটে সূচকটি প্রকাশিত হয়।

সূচক অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতের অবস্থান ১০১তম,স্কোর ২৭ দশমিক ৫। পাকিস্তানের অবস্থান ৯২তম স্কোর ২৪ দশমিক ৭।

উল্লেখ্য, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে কারও স্কোর শূন্য হলে বুঝতে হবে সেখানে ক্ষুধা নেই। আর স্কোর ১০০ হওয়ার অর্থ সেখানে ক্ষুধার মাত্রা সর্বোচ্চ।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের মাধ্যমে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের ক্ষুধার মাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অপুষ্টির মাত্রা, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের উচ্চতা অনুযায়ী কম ওজন, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের বয়স অনুযায়ী কম উচ্চতা এবং শিশুমৃত্যুর হার হিসাব করে ক্ষুধার মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বৈশ্বিক, আঞ্চলিক বা জাতীয় যেকোনো পর্যায়ে ক্ষুধার মাত্রা নির্ণয় করতে এ সূচকগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সিলেটে নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম অটিস্টিক স্কুল

সিলেটে নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম অটিস্টিক (বিশেষ শিশু) মডেল স্কুল। প্রায় দেড় কোটি টাকা বাজেটে এ স্কুলটি তৈরির জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে আব্দুল মোমেনের বিশেষ পত্রের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে ২০ লাখ টাকা বরাদ্দও দেওয়া হয়েছে। ১১ হাজার দুইশত স্কয়ার ফুটের 'মডেল অটিস্টিক' স্কুলের চার তলা এ ভবনটির নামকরণ করা হবে সিলেটের প্রয়াত চিত্রশিল্পী অরবিন্দ দাস গুপ্তের নামে। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে নতুন এ ভবনের নকশাও। সিলেট নগরীর শাহী ঈদগাহ এলাকায় টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারের পাশে এ ভবন নির্মিত হবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এর বাস্তবায়ন করবে জেলা পরিষদ, সিলেট।

হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে ভারতকে সতর্ক থাকার আহবান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পূজামণ্ডপে হামলার ঘটনার প্রেক্ষাপটে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে নেতারা তাদের উদ্বেগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, এসব ঘটনায় হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কুমিল্লার ঘটনা এবং তার জের ধরে সহিংসতার ঘটনাগুলোর সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে এ নিয়ে কোন উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে না। তিনি প্রতিবেশী ভারতের উদ্দেশেও হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, তাদেরও সচেতন থাকতে হবে। সেখানেও (ভারতে) এমন কিছু যেন না করা হয়-যার প্রভাব আমাদের দেশে এসে পড়ে। আর আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত আসে। প্রতিবছরের মত এবারও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা বা প্রতিনিধিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।

বিশ্বব্যাপী পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন

পরওয়ান ডেস্ক :

ব্যাপক ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ বছর বিশ্বের প্রায় দেড় শতাধিক দেশ মীলাদুন্নবী পালন করেছে। এ উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে বাণী, বিবৃতি দিয়েছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সরকার প্রধান।

পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন: পাকিস্তানে গত ১৯ অক্টোবর মঙ্গলবার ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সব সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শপিংমল, ডাকঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও মসজিদগুলোতে রাতে আলোকসজ্জা করা হয়। পাকিস্তানের রেওয়াজ অনুযায়ী এ দিনে বিভিন্ন বাড়ি এবং মসজিদে বিশেষ দুআ, মিষ্টি ও খাবার বিতরণ এবং মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার এই বছর দেশব্যাপী মীলাদুন্নবী পালনের নির্দেশ দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি ড. আরিফ আলভি জাতির প্রতি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার আহবান জানিয়ে ভাষণ দেন এবং জঘন্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের ব্যতীত বন্দীদের জন্য ৯০ দিনের জন্য বিশেষ মওকুফ ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও এ উপলক্ষে বিশেষ বার্তায় নবীর শিক্ষা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন।

তুরস্ক রাষ্ট্রীয়ভাবে মীলাদুন্নবী: মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লাইলাতুল মাওলুদ) উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বাণী দিয়েছেন।

তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা বার্তায়, তিনি বলেছেন, "আমি আমাদের জাতি এবং ইসলামী বিশ্বকে লাইলাতুল মাওলিদের অভিনন্দন জানাই এবং আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এই বরকতময় রাতে, যে রাতে আমাদের নবী তাঁর জন্মের সাথে সমগ্র বিশ্বকে আনন্দিত করেছিলেন। সমস্ত মানবতার জন্য এটি একটি আশীর্বাদ হোক।" তিনি দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন।

এদিকে তুরস্কের শীর্ষ ধর্মীয় সংস্থা দিয়ানতের প্রধান আলী এরবাস এ উপলক্ষে একটি বার্তায় বলেছেন, নবীর আগমনে পৃথিবী থেকে সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

থাইল্যান্ডে মীলাদুন্নবী: মীলাদুন্নবী উপলক্ষে এ বছর থাই মুসলমানরা সপ্তাহব্যাপী মাওলুদ আন-নবী উদযাপন করেছেন। দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত মাওলুদ আন-নবী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দেশটির রাজার প্রতিনিধি প্রিন্স মহা ভাজিরালংকর্ন এইচআরএইচ ক্রাউন।

মালয়েশিয়ায় মীলাদুন্নবী: দেশব্যাপী মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন হয়েছে মালয়েশিয়ায়। স্থানীয়ভাবে, এটি 'মওলুদ' বা 'মৌলুদুর রাসূল' হিসাবে পরিচিত। দিনটিতে জাতীয় সরকারী ছুটি ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার।

ভারতে মীলাদুন্নবী: এ বছর ১৯ অক্টোবর ভারতে পালিত হয়েছে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য প্রতি বছর ভারতে দিবসটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ব্যাংক, ডাক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে আজমীর শরীফে ঐদিন রাতব্যাপী আলোচনা সভা, না'ত ও মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বকারী সর্ববৃৎ মুসলিম সংগঠন অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তিহাদুল মুসলিমীন (আইমিম এর) এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় দারুস সালাম (হায়দারাবাদ) প্রাঙ্গণে সংগঠনের প্রধান ব্যারিস্টার আসাদ উদ্দিন ওয়াইসির নেতৃত্বে লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে মীলাদুন্নবীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দেশখ্যাত উলামাগণ উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন।

ভারতের কেরেলা রাজ্যে, রাজ্যের বৃহৎ দ্বীনি মারকাজ মারকাজু সাকাফাতিল ইসলামিয়া এর উদ্যোগে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এতে মারকাজের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান সূচীর মধ্যে রয়েছে রবিউল আওয়াল মাসের প্রতিদিন বাদ আসর ও সুবহে সাদিকের সময়ে তাওইয়াল্লুদ পাঠ ও মীলাদ-কিয়াম, মাসের ১ম ও ১২ তারিখে মীলাদুন্নবীর র‍্যালি ইত্যাদি।

এছাড়াও দেশের সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। এবং পশ্চিম বঙ্গে দিনটিকে "বিশ্ব নবী দিবস" হিসাবে পালন করা হয়।

ফিলিপাইনে মীলাদুন্নবী: ফিলিপাইনে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাওলুদ আন-নবী) গুরুত্বের সাথে উদযাপন করা হয়। বিভিন্ন শহর ও জনপদে বসবাসকারী মানুষ এ উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করে থাকে। দেশটির পুরুষ, মহিলা এবং শিশু সহ বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা অনেক দিন আগে থেকেই অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা শুরু করে। এ বছর ১৯ অক্টোবর দেশটিতে মীলাদুন্নবী উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে সে দেশের সরকার।

মিশরে মীলাদুন্নবী: মিশরে এ বছর প্রথম ঘটা করে মাওলুদ (মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উৎসবের আয়োজন করেন দেশটির সুফিবাদে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ। মিশরের রাজধানী তাহরির স্কোয়ারের গ্রীক ক্যাম্পাসে গত ১৬ অক্টোবর মাওলুদ আন-নবী উপলক্ষে জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এতে মিশরের সরকারি পদস্ত কর্মকর্তাসহ গ্রান্ড মুফতীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী মীলাদুন্নবীর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

ইয়েমেনে মীলাদুন্নবী: ইয়েমেনে এবার ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। গত ১৮ অক্টোবর মাওলিদের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন রাজধানী সাবার আল-সাবাইন স্কয়ারে। আল-সাবাইন স্কোয়ার ছাড়াও এদিন দেশটির বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে মাওলুদ আন-নবী মাহফিল।

তিউনিশিয়ায় মীলাদুন্নবী: তিউনিশিয়ায় ধর্মীয় ভাবাবেগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সরকারি ছুটি ছিল দেশটিতে।

মরক্কোয় মীলাদুন্নবী: প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গত ১৮ অক্টেবর, মরক্কোরা স্থানীয় ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি অনুসরণ করে উদযাপন করেছেন ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঐদিন তারা খাবার বিতরণ, কুরআন তিলাওয়াতে ও ঈদ আল মাওলুদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।এ উপলক্ষে দেশটিতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়।

আমেরিকায় মীলাদুন্নবী: এ বছর আমেরিকায় পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে মাসব্যাপী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশটিতে অভিবাসী মুসলিমরা বিভিন্ন শহরে এ মাহফিলের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানগুলোয় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন,

বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর মুহতারাম সভাপতি আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী।

যুক্তরাজ্যে মীলাদুন্নবী: পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে এবার 'মাওলুদ ইন দ্যা সিটি' নামে ভিন্নধর্মী আয়োজন করেছে ম্যানচেস্টারের একঝাঁক মুসলিম যুবক। তাঁরা ইসলামের শাশ্বত বাণী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ম্যানচেস্টার সিটি সেন্টারে অমুসলিমদের মাঝে সাত শতাধিক গোলাপ ফুল, সুইট এবং ইসলামের বাণী সম্বলিত কার্ড বিতরণ করেন। এছাড়াও লন্ডনের দারুল হাদীস লতিফিয়া, বার্মিংহামের সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদ, ম্যানচেস্টারের শাহজালাল জামে মসজিদ সহ বিভিন্ন শহরে ব্যাপকভাবে মীলাদুন্নবী ﷺ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চীন থেকে 'কুরআন মজিদ' অ্যাপ সরিয়ে নিল অ্যাপল

সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় 'কুরআন মজিদ' অ্যাপ। অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে এটি পাওয়া যায় এবং এর রিভিউর সংখ্যা দেড় লাখের মতো। সারা বিশ্বে লাখ লাখ মুসলিম এই অ্যাপটি ব্যবহার করেন। চীনের মুসলিমদের কাছেও এটি খুব জনপ্রিয়। প্রায় ১০ লাখের মতো ব্যবহারকারী রয়েছে চীনে। সম্প্রতি **চীনে কর্মকর্তাদের অনুরোধে অ্যাপল বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় এই কুরআন অ্যাপ চীন থেকে সরিয়ে নিয়েছে। তবে** এ বিষয়ে চীন সরকার এখনও কোন মন্তব্য করেনি। অ্যাপলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অবৈধ ধর্মীয় টেক্সট থাকার কারণে এই অ্যাপটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সৌরজগতের বৃহস্পতি গ্রহে মহাকাশযান পাঠিয়েছে নাসা

জুপিটার বা বৃহস্পতিগ্রহের কাছে যেসব গ্রহাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলো পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখতে বৃহস্পতি গ্রহে 'লুসি' নামের একটি মহাকাশযান পাঠিয়েছে নাসা। গত ১৭ অক্টোবর ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে এই মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

নাসা বলছে, বৃহস্পতিগ্রহের কক্ষপথে গ্যাসের যে বিশাল আস্তরণ আছে, সেখানে গ্রহাণুর যে ঝাঁক বেধে ঘুরতে থাকে, সেই গ্রহাণুগুলো পর্যবেক্ষণ করবে মহাকাশ প্রোব লুসি। একে বলা হচ্ছে সৌরজগতের 'জীবাশ্ম' খোঁজার অভিযান।

পাকিস্তানে শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহত ২০ আহত ৩ শতাধিক

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতে অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তিন শতাধিক। গত ৭ অক্টোবর সকালে রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৯। খবর ডন ও বিবিসির।

পাকিস্তানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন,নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ভূমিকম্পের পর বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার লোকজন শহরের রাস্তায় নেমে এসেছেন। পাকিস্তানের একজন সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, ভূমিকম্পে দালান ধসে এসব মানুষের প্রাণহানি হয়। আহত হয়েছেন প্রায় ৩০০ জন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এখনো উদ্ধার অভিযান চলছে।

আফগানিস্তানের শিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ

আফগানিস্তানের একটি শিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গত ১৫ অক্টোবর শুক্রবার দেশটির কান্দাহার শহরের বিবি ফাতিমা শিয়া মসজিদে এ বিস্ফোরণ হয়। এতে ৩২ জন মুসল্লি নিহত ও প্রায় ৪৫ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় গণস্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এমন খবর প্রকাশ করেছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

এদিকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে,বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন অন্তত ৯০ জন। স্থানীয় সময় শুক্রবার জুমার নামাজ চলাকালে বিস্ফোরণটি ঘটে। বিস্ফোরণে মসজিদের জানালার কাচ ভেঙে গেছে। এ সময় অনেককে মসজিদের মেঝেতে শুয়ে কাতরাতে দেখা যায়।

জানা যায়, বিবি ফাতিমা মসজিদটি ওই শহরের সবচেয়ে বড় শিয়া মসজিদ। বিস্ফোরণের সময় সেখানে প্রায় ৫০০ জন মুসল্লি নামাজ আদায় করছিলেন।

আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সাইদ খোসতি এক টুইট বার্তায় বলেছেন, 'শিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হওয়ার খবরে আমরা ব্যথিত হয়েছি। বিস্ফোরণে অনেকে শহীদ হয়েছেন, অনেকে আহত হয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, ঘটনার ভয়াবহতা নিরূপণে এবং হামলাকারীদের ধরতে তালেবানের বিশেষ বাহিনী কাজ করছে।

বিবিসির তথ্যমতে, ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, এটি আত্মঘাতী বোমা হামলা। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় মিরওয়াইস হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানান হাসপাতালের একজন চিকিৎসক।

শর্তারোপ করে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে দেশটির প্রশাসন। যাঁরা করোনার পূর্ণ ডোজ টিকা নিয়েছেন, আগামী ৮ নভেম্বর থেকে তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা নেই বলে ঘোষণা দিয়েছে হোয়াইট হাউস।

বিবিসির বরাতে জানা গেছে, গত ১৫ অক্টোবর হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জানিয়েছেন, পূর্ণ ডোজ করোনার টিকা নেওয়া এবং ভ্রমণের ৭২ ঘণ্টা আগে যাঁদের করোনার নেগেটিভ ফল থাকবে, তাঁরাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে কোয়ারেন্টিনে থাকার নিয়মও তুলে নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন।

ত্রিপুরায় মুসলিমদের ওপর হামলা ৬ মসজিদে আগুন

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়েছে। গত ২০ অক্টোবর রাজ্যজুড়ে চলা এই হামলায় অন্তত ছয়টি মসজিদ এবং এক ডজনেরও বেশি বাড়িঘর-দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যভিত্তিক দৈনিক দ্য সিয়াসাত ডেইলি।

ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বজরং দল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) ব্যানারধারী কিছু সদস্য এই হামলার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে পত্রিকাটি।

ভারতের মুসলিম ছাত্রদের সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার কর্মী শফিকুর রহমান জানিয়েছেন, ২০ অক্টোবর রাতে একযোগে ত্রিপুরার গোমতি জেলার উদয়পুর ও রাজ্যের কৃষ্ণনগর, ধর্মনগর, পানিসাগর ও চন্দ্রপুরের ছয়টি মসজিদে হামলা চালানো হয়। উদয়পুর ও পানিসাগরের মসজিদ হামলাকারীরা পুড়িয়ে দিয়েছে, বাকিগুলোতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। সবগুলো এলাকায় মিছিল করে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন শফিকুর রহমান।

জানার আছে অনেক কিছু

বাঘ

● বিড়াল প্রজাতির সবচেয়ে বৃহত্তম প্রাণী হলো বাঘ। একটি পুরুষ বাঘের ওজন প্রায় ৩০০ কেজি যা প্রায় ৫ জন মানুষের গড় ওজনের সমান। সাধারণত এর আয়ুষ্কাল প্রায় ২৫ বছর। তবে পুরুষ বাঘ নারী বাঘিনির তুলনায় কমদিন বেঁচে থাকে।

● বাঘের থাবা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর থাবা। যদি সে এক পা দিয়ে আক্রমণ করে তবুও একজন মানুষের হাড় ভেঙ্গে ফেলার জন্য তা যথেষ্ট। এজন্য কঠিন পরিস্থিতি তথা নিশ্চিত পরাজয় বুঝাতে 'বাঘের হাতে পড়া' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

● বাঘের ছানা অন্ধ হয়ে জন্মায় এবং ঠাণ্ডা ও রোগে প্রায়শই তাদের অর্ধেক মারা যায় । অন্ধ হয়েও বাঘ শাবক মা বাঘের ঘ্রাণ অনুসরণ করে দিব্যি চলাফেরা করতে পারে। মাস দুয়েক পর বাঘ শাবকের চোখ ফোটে।

● বাঘের লালা এন্টিসেপ্টিক হিসেবে বিবেচিত। যখন বাঘ নিজে বা তার শাবক চোট পায়, তখন লালা দিয়ে চেটে দিলে আঘাত সুস্থ হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, বাঘের লালা পর্যাপ্ত না থাকার কারণে বাঘের মুখে প্রচণ্ড দূর্গন্ধ হয়।

● আমাদের আঙ্গুলের ছাপের মধ্যে যেমন কোন মিল নেই, বাঘের ডোরাকাটার মধ্যেও তেমন মিল নেই। প্রতিটি মানুষের আঙ্গুলের ছাপ যেমন ভিন্ন তেমনি প্রতিটি বাঘের ডোরাকাটা ভিন্ন।

● বাঘ খুবই কম গর্জন করে থাকে। পুরুষ বাঘ এতটাই হিংস্র যে, নারী ও শাবক কে প্রায়শই সে খেয়ে ফেলে। এজন্য প্রচুর বাচ্ছা জন্ম দিলেও বাঘ খুব বেশি বৃদ্ধি পায় না।

● বাঘ খুব সহজে অন্য প্রাণীর ডাক অনুকরন করতে পারে। এই অনুকরণের ফলে অনেক প্রাণী বিভ্রান্তির শিকার হয় এবং বাঘের ফাঁদে ধরা দেয়।

● মানবজাতি কর্তৃক প্রতিবছর লাখো একর বনভূমি ধ্বংসের ফলে বাঘ এখন বিলুপ্তির মুখে। যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথসোনিয়াম কনজারভেশন বায়োলজি ইন্সটিটিউটের গবেষণায় জানা যায়, বাঘের চারণভূমি হিসেবে পরিচিত বিশ্বের প্রায় ৯৩ ভাগ বন ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে বাঘ লোকালয়ে হানা দিচ্ছে এবং মানুষকে আক্রমন করছে।

● পৃথিবীতে 'মানুষ দিবস' বলে কিছু না থাকলেও বাঘ দিবস আছে। ২০১০ সাল থেকে ২৯ জুলাইকে বিশ্ব বাঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

● ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রথমবারের মতো বিশ্ব বাঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৩টি দেশ এতে অংশ নিয়েছিলো।

● বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের গণনা অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের সুন্দরবনে প্রায় ১১৪টি বাঘ রয়েছে।

সংকলনেঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

বিজ্ঞান

পরওয়ানা ডেস্ক

সবচেয়ে সাদা রঙের গিনেজ রেকর্ড : হতে পারে এসির বিকল্প

বাড়ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। উষ্ণ এ পৃথিবীতে মানুষের বসবাস এখন অনুপযোগী হয়ে যাচ্ছে। তাই দৈনন্দিন জীবনে মানুষ স্বস্তিতে থাকতে ব্যবহার করছে বিভিন্ন যন্ত্র। তেমনই এক যন্ত্রের নাম এয়ার কন্ডিশনার বা এসি। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এই যন্ত্রের রয়েছে বহুল ব্যবহার।এবার এসির বিকল্প হিসেবে ভিন্ন এক সাদা রঙ আবিষ্কারের দাবি করলেন বিজ্ঞানীরা।বিশ্বের সবচেয়ে সাদা এ রঙ তৈরি করলেন যুক্তরাষ্ট্রের পুর্দু ইউনিভার্সিটির গবেষকরা। এ রঙ এতটাই চোখ ধাঁধানো যে 'সবচেয়ে সাদা' হিসেবে এর নাম উঠেছে গিনেজ বুকে। তবে কৃতিত্বটা এখানেই শেষ নয়। গবেষণায় দেখা গেলো এই রঙ বাড়ির ছাদ ও দেয়ালে ব্যবহার করা হলে তা সূর্যের তাপ ও ইনফ্রারেড প্রতিফলিত করবে সবচেয়ে বেশি। যার ফলে এয়ারকন্ডিশনার চালাতে হবে কম, বাঁচবে বিদ্যুৎ।

পুর্দু ইউনিভার্সিটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আবিষ্কার করা এ রঙ নিয়ে গবেষক জিউলিন রুয়ান জানালেন,'সাত বছর আগে জ্বালানি বাঁচানো ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টাকে মাথায় নিয়েই এ প্রকল্প শুরু করেছিলাম। গবেষণায় দেখা গেছে এ রঙ ৯৮ দশমিক ১ শতাংশ সূর্যের বিকিরণ প্রতিফলিত করতে পারে। বাজারের প্রচলিত সাদা রঙ যেখানে ৮০-৯০ শতাংশ প্রতিফলিত করে।

তবে নতুন আবিষ্কৃত রঙটির বিশেষত্ব হলো এটি ইনফ্রারেড তাপও প্রবেশ করতে দেবে না। যে কারণে ছাদে ও দেয়ালে এ রঙ ব্যবহার করা হলে ঘরের ভেতরটা প্রাকৃতিকভাবেই ঠান্ডা হতে থাকবে। ইউএসএ টুডের খবরে জানা গেলো, উজ্জ্বল এ রঙের সবচেয়ে সাদা হওয়ার পেছনে রয়েছে দুটি কারণ। প্রথমত-ব্যারিয়াম সালফেটের একটি নির্দিষ্ট ঘনত্ব ও রাসায়নিকটির অণুগুলোর ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি।

পুরদু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানান, দুটি বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি সবচেয়ে সাদা রঙ এ পরিণত হয়েছে- ব্যারিয়াম সালফেট নামক একটি কেমিক্যাল যৌগের নির্দিষ্ট ঘনত্ব এবং ব্যারিয়াম সালফেটের বিভিন্ন আকারের অণু। এ রঙ বাজারে আনতে পুর্দু ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এরইমধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিতে এসেছেন।

ইনসেট-
এ রঙ এতটাই চোখ ধাঁধানো যে 'সবচেয়ে সাদা' হিসেবে এর নাম উঠেছে গিনেজ বুকে। তবে কৃতিত্বটা এখানেই শেষ নয়। গবেষণায় দেখা গেলো এই রঙ বাড়ির ছাদ ও দেয়ালে ব্যবহার করা হলে তা সূর্যের তাপ ও ইনফ্রারেড প্রতিফলিত করবে সবচেয়ে বেশি।

কবিতা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম নিয়ে বিদ্রুপ করার শাস্তি

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.)

কাব্যানুবাদঃ মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান

মুখ বাঁকাল এক অভাগা
নাম নিয়ে পাক মুস্তফার
পরিণামে তেমনি বাঁকা
রয়ে গেল মুখটি তার।

ভয় পেয়ে সে তাওবা করে
গেল নবীর দরবারে
করল আরয, দয়াল নবী
দিন আমাকে মাফ করে।

'ইলমে লাদুন্নির' হে রাসূল
আপনিতো মহাভান্ডার
আপনি জানেন, আপনি ক্ষমা
করুন কসুর এ বান্দার।

ব্যঙ্গ করেছিলাম আমি
পাচ্ছি সাজা সেই পাপের
আমি এখন বনে গেছি
পাত্র সবার বিদ্রুপের।

সকাতরে এরূপ ক্ষমা
চাইল যখন সেই জনা
দয়াল নবী তখন তাকে
করে দিলেন মার্জনা।

আল্লাহ যখন চান কাহারো
যিল্লতি, বে-ইযযতি
ইচ্ছা জাগে অন্তরে তার
করতে সাধুর বদনামি।

আবার যখন চাহেন খোদা
রাখতে কারো দোষ গোপন
অন্বেষণে দোষ অপরের রুধে
রাখেন তাহার মন।

মদদ করার ইচ্ছা কারো
করলে খোদা মেহেরবান
অন্তরে তার রোনাজারির
ইচ্ছা ও ঝোঁক করেন দান।

ধন্য সে চোখ যে চোখ কাঁদে
খোদার প্রেমে সর্বক্ষণ
ধন্য সে মন– বিচ্ছেদে তাঁর
ভুনা ভুনা হয় যে মন।

শেষ অবধি পাবে সে সুখ
কেঁদেছে যার দুই নয়ান
পরিণতির চিন্তা করে যে জন
সে হয় ভাগ্যবান।

হোথাই হয় শ্যামল সবুজ
পানির ধারা যেই খানে
অশ্রু যেথা ঝরে চোখের
খোদার দয়া সেই খানে।

শস্য ক্ষেতের সেচের মতো
দাও আঁসু-সেচ অন্তরে
হাসবে শ্যামল সবুজ বাগান
তোমার হৃদয় কন্দরে।

নিজের তরে চাইলে আঁসু
পরের তরে অশ্রু দাও
রহম করো দুঃখীর পরে
যদি খোদার রহম চাও।

ক্ষমা করো হযরত

কাজী নজরুল ইসলাম

তোমার বাণী করিনি গ্রহণ
ক্ষমা করো হযরত
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ
তোমার দেখানো পথ
ক্ষমা করো হযরত।

বিলাস বৈভব দলিয়াছ পায়
ধুলিসম তুমি প্রভু
তুমি চাহ নাই আমরা হইব
বাদশা, নওয়াব কভু।

এই ধরণীর ধন সম্পদ
সকলে তাহে সম অধিকার
তুমি বলেছিলে ধরণীতে সবে
সমান পূত্রবৎ
ক্ষমা করো হযরত।

তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীদের
তুমি ঘৃণা নাহি করে,
আপন তাদের করিয়াছ সেবা
ঠাঁই দিয়েছ তুমি ঘরে।

ভিন্ন ধর্মীর পূজা মন্দির
ভাংতে আদেশ দাওনি, হে বীর!
আমরা আজিকে সহ্য করিতে
পারিনা পরমত
ক্ষমা করো হযরত।

তুমি চাও নাই ধর্মের নামে
গ্লানিকর হানাহানি,
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে
দিয়েছ অমর বাণী।

মোরা ভুলেগিয়ে তব উদারতা
শার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেস্ত থেকে ঝরেনাকো আর
তাই তব রহমত।

তোমার বাণীকে করিনি গ্রহণ
ক্ষমা করো হযরত
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ
তোমার দেখানো পথ
ক্ষমা করো হযরত।

গল্প

সততার দৃষ্টান্ত

মুহাম্মাদ উসমান গণি

বাগদাদ নগরী। জ্ঞানরাজ্যের এক পোতাশ্রয়। পৃথিবীর দিক বিদিক থেকে ছুটে আসেন জ্ঞান পিপাসুরা। জ্ঞানের বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে সর্বত্র। কিশোর আবদুল কাদির, বাস করেন জিলান শহরে। জ্ঞান শিক্ষার প্রতি তার চরম আগ্রহ। দরিদ্র মায়ের সন্তান হিসেবে দূরে কোথাও সফরের ব্যয় সংকুলান কঠিন হবে মনে করে কোথাও যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। কিন্তু মনে আগ্রহের কোনো শেষ নেই। হঠাৎ জানতে পারলেন একটি বণিক কাফেলা যাবে বাগদাদ। তিনি মনস্থির করলেন তাদের সাথেই যাবেন জ্ঞানরাজ্যের স্বপ্নের শহর বাগদাদে। মায়ের নিকট থেকে অনুমতিও পেলেন। মা তার সন্তানকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দিলেন। ছেলের হাত খরচ হিসেবে ৪০টি দিনার জামার আস্তিনে সেলাই করে দিলেন যেন আর্থিক সংকটে তা কাজে লাগে। বিদায়কালে মা সর্বদা সত্য কথা বলতে নসীহত করলেন।

রওয়ানা হলো কাফেলা। সাথে কিশোর আবদুল কাদির। পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ। পথিমধ্যে হঠাৎ ডাকাত দলের আক্রমণ। এলোপাতাড়ি লুটপাট শুরু করলো ডাকাত দলটি। সকলের নিকট থেকে যা পেয়েছে ছিনিয়ে নিয়েছে এরা। আবদুল কাদির ছোট বলে তার কাছে এলোনা। কিন্তু একটি ডাকাত কিশোর আবদুল কাদিরকে জিজ্ঞেস করে এই ছেলে! তোমার কাছে কী কিছু আছে? তিনি ঝটপট উত্তর দিলেন, হ্যাঁ অবশ্যই আছে। আমার জামার আস্তিনে ৪০টি দিনার আছে। তারা ঠাট্টা মনে করে হাসাহাসি করতে লাগল। তাদের সরদারের কাছে খবর দিলে সরদার কিশোরটিকে নিয়ে যেতে আদেশ করে। একজনকে আবদুল কাদিরের জামার আস্তিন পরীক্ষা করতে বলে। ঠিকই তার আস্তিনে ৪০টি দিনার পাওয়া গেল। ডাকাত সরদার খুবই আশ্চর্য হলো এবং জিজ্ঞেস করল তুমিতো তোমার লুকানো দিনারের কথা অস্বীকার করলেও পারতে, তা না করে বলে দিলে কেন?

কিশোর আবদুল কাদির বললেন, আমার মা আমাকে বিদায় জানানোর সময় সত্য কথা বলার নসীহত করেছিলেন। আমিতো আমার মায়ের কথা অমান্য করতে পারিনা। কিশোর আবদুল কাদিরের কথা শুনে ডাকাত সরদার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বলতে লাগল, তুমি তোমার মায়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাকে এতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছ অথচ আমি প্রতিনিয়ত আমার রবের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে যাচ্ছি।

ডাকাত সরদার কিশোর আবদুল কাদিরের কাছে নতি স্বীকার করল এবং তার হাতে হাত রেখে বিগত জীবনের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করে ক্ষমা চাইল। বলল, হে বালক! তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। ডাকাত সরদারের এরকম অনুশোচনা দেখে তার সঙ্গী সাথিসহ পুরো ডাকাত দল হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর হাত ধরে তাওবা করল। লুট করে নেওয়া জিনিসপত্র ফেরত দিয়ে দিল। সবাই একসাথে দ্বীনের পথে ফিরে আসলো।

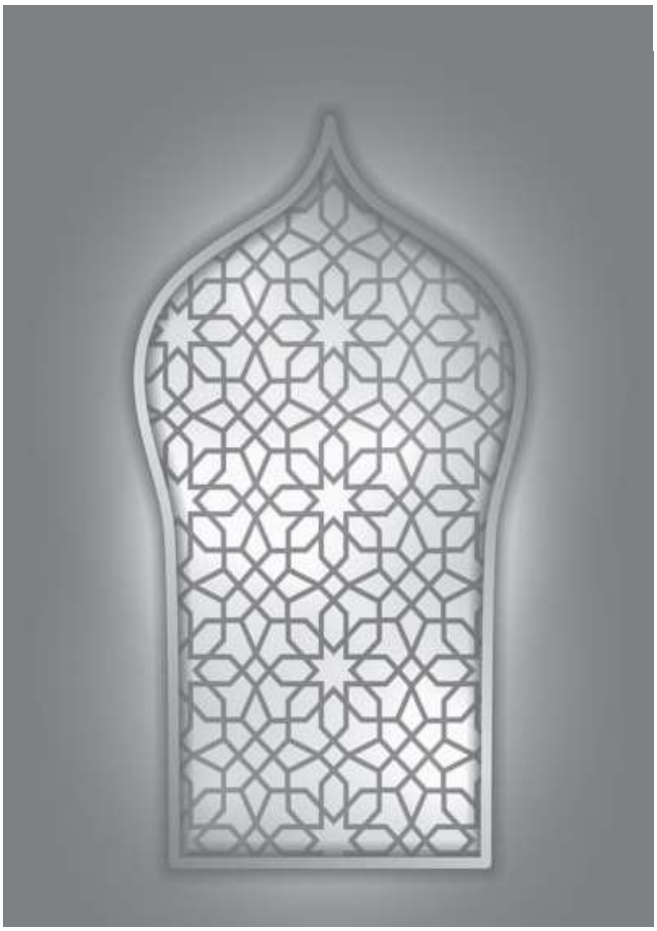

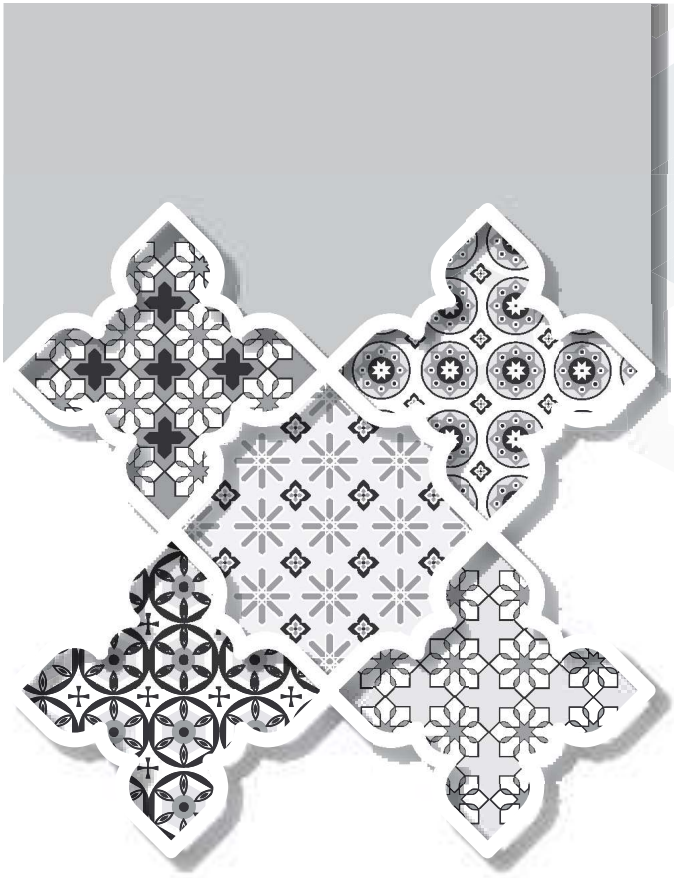

খলীফার সীমাহীন মহানুভবতা

ইকবাল কবীর মোহন

খ্রিস্টানরা জেরুযালেমে পরাজিত হলো। বিজয়ের পতাকা উড়লো মুসলমানদের। কথা ছিল নগরীকে হযরত উমর (রা.) এর হাতে তুলে দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী নগরীর দায়িত্বভার খলীফার হাতে অর্পণ করা হলো।

উমর (রা.) ইসলামের প্রথম কিবলাহ বাইতুল মুকাদ্দাস দেখার ইচ্ছা পোষণ করলেন। খলীফাকে বাইতুল মুকাদ্দাস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানোর জন্য দিনক্ষণ ঠিক করা হলো। কিন্তু যাত্রার আগে জেরুযালেম বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধানরা খলীফাকে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন একটু ভালো পোশাক পরিধান করেন। কথা শুনে কিছুটা ভেবে নিয়ে খলীফা রাজি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত পোশাক এবং একটি বলবান ঘোড়া আনা হলো।

তিনি এসবের দিকে তাকালেন। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিলেন। খলীফার মনে ভয় উদিত হলো। জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক তিনি পরতে চাইলেন না। তাই তিনি সেগুলো ফেরত নিতে বললেন। তিনি বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জিনিস মানুষকে অহংকারী করে তুলে তা বর্জণীয়। তাই এ পোশাক এবং ঘোড়া আমি ব্যবহার করতে পারি না।

তারপর খলীফা তার পুরনো পোশাক পরিধান করলেন এবং লাল অশ্বে আরোহণ করে রওয়ানা দিলেন। কথা ছিল খলীফা খ্রিস্টানদের গীর্জাও পরিদর্শন করবেন। খ্রিস্টানরা তাই বাদশাহী পোশাক এবং শান-শওকতের সাথে আগত খলীফা উমর (রা.) কে স্বাগত জানানোর জন্য গীর্জার দ্বারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। পারস্য ও রোমান সম্রাটের সাথে বিজয়ী মুসলিম খলীফার আগমন ও জৌলুস দেখার জন্য খ্রিস্টানদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু তারা সহসাই খুব বিস্মিত হলো।

চোখে মুখে তাদের সীমাহিন বিস্ময়। তারা বিশ্বাসই করতে পারল না যে, বিশ্বের সেরা শাসক হযরত উমর (রা.) ধূলি ধুসরিত পোশাকে লাল অশ্বে চড়ে আসছেন। খলীফার পরনে তালি দেওয়া পোশাক ও মাথায় মোটা কম্বলের পাগড়ি। গীর্জার প্রধান ধর্মযাজক সফ্রেনিয়াস ভয়ে বিস্ময়ে ভক্তিতে মোম হয়ে গেল। তারা হযরত উমরকে গীর্জা ঘুরে ঘুরে দেখালো।

নামাযের সময় এলো। খলীফার মনোভাব বুঝে ধর্মযাজক উমরকে গীর্জায় নামায পড়তে বললেন। কিন্তু উমর গীর্জার বাইরে নামায পড়লেন। পরে ধর্মযাজক জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন গীর্জায় নামায পড়লেন না। খলীফা বললেন, আমি যদি গীর্জায় নামায পড়তাম তাহলে ভবিষ্যতে মুসলিম সাম্রাজ্যের গীর্জাগুলো মসজিদে রূপান্তরিত হবে।

সফ্রেনিয়াস এ কথা শুনে আরেকবার অভিভূত হলেন। তিনি শুধু অভিভূতই হলেন না। খলীফার উদারতায় সফ্রেনিয়াসের সামনে অজানা জগতের এক দ্বার খুলে গেল। একজন বিজিত শাসকের মধ্যে এত উদারতা, এত মহানুভবতা এবং নিরংকার থাকতে পারে তা সফ্রেনিয়াস কল্পনাই করতে পারেনি। ইসলামের আদর্শই মানুষকে এত মহৎ ও মহানুভব করে যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়।

মা আমার

আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

আমি তখন যুবক। আমার ওয়ালিদ মুহতারাম আল্লামা ফুলতলী (র.) এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলা হজ্জ ও যিয়ারত নসীব করলেন।

বিদায় বেলায় ভাই-বোন সকলেই ঘরের বারান্দায় আমার চতুষ্পার্শ্বে চাটাইর উপর বসে বিদায়ের দৃশ্য অবলোকন করছেন। আমার মুহতারাম ওয়ালিদ ছাহেব ও আম্মাজান ২টি ছোট চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছেন।

বিদায় বেলায় মা-বাবার সামনে অবুঝ শিশুর মতো অবনত মস্তকে চাটাইর উপর বসলাম। আমার কম্পিত হাতখানা মায়ের মুবারক চরণে রেখে কয়েকবার কান্না মিশ্রিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম- মা.. মা.. মা..। মা তার কোমল হাতখানা আমার মাথায় রাখলেন। কয়েকবার শাড়ীর আঁচলে নয়নের জল মুছলেন। অনুভব করলাম, মা ও বাবার স্নেহ দৃষ্টি আমার মাথার উপর এক নূরানী চাদর হয়ে ছায়া দান করছে।

আমার ওয়ালিদ ছাহেব মা ও ভাই-বোনকে নিয়ে দুআ করলেন। শেষ মূহুর্তে মা বিনীত ভাবে বাবার কাছে একটি আবদার করলেন। তিনি আমার ওয়ালিদ ছাহেবকে কেঁদে কেঁদে বললেন "আমার ছেলেটির দিকে খেয়াল রাখবেন"। বাবা, এই আবদার শুনে কাঁদলেন। তারপর হাসি মুখে বললেন "ছেলেটি কি শুধু তোমার", সে তো আমারও ছেলে। ইন শা আল্লাহ! সবসময় তার দিকে খেয়াল রাখব।

কুরবানীর দিন ভোরে সফরসঙ্গী কয়েকজনের সঙ্গে কুরবানীর স্থানে পৌঁছলাম। অত্যধিক ভিড়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। আমাদের তাবুর সন্ধানে সকাল ১০টা থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত একটানা হাঁটতে থাকলাম। ইহরামের কাপড় গায়ে, সঙ্গে কিছু পয়সা (রিয়াল) ছিল। মাঝেমধ্যে চাটাই বিছানো রেস্তোরাঁয় চা-পান করলাম। ইহরাম পরিহিত মানুষের সাথে পথের পাশে খালি জায়গায় বালুকাময় স্থানে নামায আদায় করলাম।

এক ময়দানে বিরাট তাবুর নিচে হারিয়ে যাওয়া নারী-পুরুষ, শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ বসে আছেন। তাদের মুআল্লিমের নাম মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে।

যে তাবুতে আমরা ছিলাম তার পরিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। ভোরে এখানে কোন গাড়ি ছিল না এখন গাড়ি, দোকান ছিল না এখন দোকান। আমাদের তাবু পরিচয় করা মুশকিল হয়ে পড়ল।

হঠাৎ দেখি আমাদের মুআল্লিম ছাহেব এক রেস্তোরাঁর চাটাইর উপর বসে চা পান করছেন। তিনি আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন। একটা পর্দা সরিয়ে বললেন এইতো আমাদের তাবু। তাবুতে প্রবেশ করে দেখলাম আমার বাবা আমার জন্য সঙ্গীগণকে নিয়ে রাব্বে কারীমের দরবারে আকুল কান্না কাঁদছেন। তিনি দাঁড়িয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক্ষণ কাঁদলেন, আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর বললেন বাবা; তোমার মা বিদায় বেলায় বলেছিলেন- আমার ছেলেটার দিকে খেয়াল রাখবেন। সেই কথাটি মনে করে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে কয়েক ঘন্টা মিনার আনাচে-কানাচে তোমাকে খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইনি।

তারপর আমাকে কিছু নাস্তা ও পানি দিলেন। বললেন, তুমি শুয়ে পড়। যতক্ষণ না আমার ঘুম আসে তিনি পাশে বসে আমার মাথায় হাত রাখলেন।

আমার পিতা মকবুল ওলি ছিলেন, তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীনের সাচ্চা আশিক ছিলেন। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে দুআ করলেন, মনে হলো যেন মা-বাবার স্নেহ দৃষ্টির দান নূরানী চাদর গায়ে দিয়ে নীরবে নিরলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছি।

আমার মা ও বাবার প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় ভর্তি করার জন্য অনেক স্বামী হারা দুঃখিনী মা তাদের সন্তানকে নিয়ে আসেন। বিদায় বেলায় ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের মাথায় হাত রেখে অনেক্ষণ কাঁদেন আর বলেন "রাহমান রাহীম তোমার হাতে আমার অসহায় ইয়াতীমকে সোপর্দ করে গেলাম"। আমাকে সম্বোধন করে কান্নামাখা বিনীত কণ্ঠে বলেন, "দয়া করে আমার অসহায় ছেলে/মেয়েটির প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন। রাহমান রাহীমের বিশাল পৃথিবীর বুকে এই অসহায় ইয়াতীমের কোন ছায়া নেই।

দুঃখিনী বিধবা মায়ের কথাগুলি যখন শুনি তখন হজ্জের বিদায় বেলায় মায়ের কণ্ঠে যে কথা শুনেছিলাম "আমার ছেলেটির প্রতি খেয়াল রাখবেন" আমার হৃদয়ের কান দিয়ে শ্রবণ করি।

মনে হয় যেন আমার মা জননী কবর থেকে উঠে স্বশরীরে এই দুঃখিনী মায়ের পাশে বসে বলছেন "বাবা, তুমি এই দুঃখিনী বিধবা মায়ের অসহায় ইয়াতীমের সেবায় তোমার যা কিছু আছে সব উজাড় করে দাও। আল্লাহ তাআলা তোমাকে রহমতের ছায়া-মায়া দান করবেন।

হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ
পিয়ার মাহমুদ

দেখিনি কখনো বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ
ভারতে দেখেছি কত হাজার বার হয়েছি তো বাকরুদ্ধ
আজ কেন হয় এদেশে আমার এমন ষড়যন্ত্র
সব মিলে বের করতেই হবে কারা দেয় এসব মন্ত্র।

দাঙ্গায় যদি জড়িয়ে পড়েন হিন্দু-মুসলমান
কার স্বার্থ বেশি হয় তাতে বিবেচনায় যদি যান
লাগবেনা বেশ স্বার্থবাদীর মুখোশ উন্মোচনে
চশমা ছাড়াই দেখতে পাবেন নিজের দুই নয়নে।

আমি বলি নাতো ওরা দায়ী বা এরা দায়ী হয়
দায় দায়িত্ব এমন জিনিস যা চাপিয়ে দেবার নয়
সরকারি দলের দায়টুকু তাতে বেশি-ই থেকে যায়
এই দায় হতে খুব সহজে মুক্তি পাওয়াটা দায়।

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধটা যদি লাগে
ভারতের যদি সুযোগ নেয়াটার অভিপ্রায় তাতে জাগে
কে না জানি কার স্বার্থ সেখানে বড় বেশি লেগে আছে
দায়টা তো তার নিতেই হবে আম জনতার কাছে।

তাই বলি আজ আম জনতা না ঘুমিয়ে জেগে রও
স্বাধীনতা আর সার্বভৌম রক্ষায় এক হও
তা না হলে তাতে হিন্দু-মুসলিম কার হবে বেশ ক্ষতি
এখনো বুঝনা যাচ্ছে কোথায় বাংলাদেশের গতি?

এপারে রয়েছে তাদের এবং ওপারে রয়েছে মোদের ভাই
এই চেতনাটা হিন্দু-মুসলিম সবার হৃদয়ে থাকাটা চাই
ছোট দেশ হলে বড় দেশ যারা তাদের কিছুটা ডরাতে হয়
যদিও আমরা মুসলিম যারা শহিদী মরাকে করি না ভয়।

নামায কায়িম করো
আলিম উদ্দিন আলম

আযান যদি হয় মিনারে
থাকো যদি ঐ কিনারে কিংবা দূরে কোথাও
কাজে নাহি ব্যস্ত থেকে
কাজগুলোকে একটু রেখে মসজিদেতে যাও।

সিজদা দিয়ে তনে মনে
বলবে যখন এই জবানে রাব্বিইয়াল আলা
শান্তি জীবন দান করবেন
তোমার উপর খুশি হবেন আল্লাহ তাআলা।

নবী বলেন সালাত সালাত
খোদার সাথে হয় মুলাকাত নামায যখন পড়
নামায হলো ঈমানি সাজ
মুমিন যারা তাদের মিরাজ নামায কায়িম কর।

তোমাকে ভালোবাসি হে নবী
হামিদ মাহমুদ

তোমাকে ভালোবাসি হে নবী
গুনাগার উম্মাতের তুমি যে সবি।
বিরহের ব্যথা রেখে তোমাকে চাই
তবুও যেন এ জীবনে তোমার দীদার পাই।

জীবনভর যেন নবীর আদর্শে চলি
কবুল করো মাবুদ আমার মিনতিগুলি
যার পরশে আলোকিত তামাম জাহান
সব পারো মাওলা তুমি, তুমি যে মহান।

মক্কা মদীনার অলি গলিতে যেতে চাই বারবার
সালাত সালাম প্রেরণ করবো হাজার হাজার।
কবে আসবে ডাক মদীনা থেকে নূর নবীর স্মরণে
ব্যাকুল মনটা খোঁজাখুজি করে তোমার চরণে।

অনুশোচনা
ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

আমার লেখায় জাগবেনা কেউ
চেতবে নারে ঠিক
মনটা যে চায় সত্য বলে
হই দূর্জয় নির্ভিক।

আমার কলমে; নেইতো জানি
তেজস্বী সে বল
সত্য ন্যায়ের পরশ আসুক
নাই যে কোন ছল।

চাই হতে তাই এক রেনেসাঁর
তাগুতে করি না সন্ধি
নজরুল ফররুখের উত্তরসূরি
বিবেক নয় কারো কাছে বন্ধি।

ভিনদেশি খেলায় রাত্রি জেগে
অপসংস্কৃতি করো লালন
লজ্জা কি নেই আপন ধর্ম
করছোনা পরিপালন।

জাগতে হবে বাঁচার জন্য
বিলাতে হবে প্রাণ
ভোগ বিলাসে মত্ত হলে
নিস্তব্ধ হবেরে ঈমান।

কথায় নয় বাস্তবেতে
ঈমানটাতে দাও শান
মানুষ হয়ে মানুষের কথা
বলরে নওজোয়ান।

মনটা আগে সাফ করেন
ইসরাত জাহান সুমি

এই করোনায় বলছো তুমি
আল্লাহ আমায় মাফ করো
আচ্ছা বলো তাইলে কেন
সারাজীবন পাপ করো?

ছেড়ে দিয়ে নামায রোযা
সময় কাটাও কৌতুকে
বোনের বিয়ে খুব সাধারণ
নিজের বিয়ে যৌতুকে!

মাফ যদি চাও রবের কাছে
রব তোমাকে মাফ করেন
তাইলে কেন পাপের পথে?
মনটা আগে সাফ করেন।

দুরূদের ফদীলত
তাজ উদ্দিন আহমদ তাজুদ

নবীজির দুরূদের
এত বেশি মূল্য
হীরা মণি মুক্তায়
হয় না যে তুল্য।

দুরূদের পাঠকের
দুজাহান ধন্য
বিপদে সুপারিশ
নবী তাঁর জন্য।

দুরূদের আমলে
শান মান বৃদ্ধি
নবীজির প্রেমে হয়
তনু মন সিদ্ধি।

একবার জপনে
জমা দশ পুণ্য
অনিহায় বরবাদ
হয় সব শূন্য।

বিশ্বাসে যদি কেউ
জপে সেই উক্তি
পরকালে নিশ্চিত
পাবে সেই মুক্তি।

আদি পিতা, মা হাওয়া
ফিরে পান স্বস্তি
মিলনের স্থান হয়
আরাফার বস্তি।

মাতা পিতা উভয়ের
বিয়ে হয় শুদ্ধ
তবে কেন এ নিয়ে
হয় খুব যুদ্ধ।

দুরূদের ব্যাপারে
ফরমান সত্য
কুরআন ও সুন্নাহে
ভূরি ভূরি তথ্য।

শরৎ এলো
তালহা শফিক

শরৎ এলো নীল আকাশে
মেঘের ডানায় চড়ে
প্রাতঃকালে দূর্বা ঘাসে
শিশির জমা পড়ে ।

শরৎ এলো ফুল কাননে
শিউলি ফোটে ডালে
চারিদিকে পুষ্পে ভরা
শাপলা ফোটে খালে ।

শরৎ এলো নদীর চরে
কাশফুলের মাঝে
রাখাল ছেলে গরু নিয়ে
বাড়ি ফেরে সাঁঝে ।

শরৎ এলো ঘরে ঘরে
বানায় সবে পিঠা
নব উৎসব সবার মনে
লাগে ভীষণ মিঠা ।

শরৎ এলো বছর ঘুরে
সবার মাঝে ফিরে
চারিদিকে পুষ্পমালা
মনকে রাখে ঘিরে ।

করোনায় জীবন জীবিকা
মো. মোস্তাফিজুর রহমান

করোনার করাল থাবায় স্তব্ধ এখন দেশ
দিনে দিনে বাড়ছে দুর্ভোগ কমছে নাতো লেশ।
চাকরি হারা দেশের অনেক শ্রমজীবি ভাই
অন্ন বস্ত্র বিহীন তারা বাঁচার উপায় চাই।

গার্মেন্টস শিল্প আমার দেশের অর্থনীতির স্তম্ভ
করোনার হিংস্র থাবায় জাতি হতভম্ব।
মালিকপক্ষ হবে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন
গার্মেন্টস নির্ভর মানুষগুলোর জীবন হচ্ছে ক্ষীণ।

দিন আনে দিন খায় তাদের তীব্র কষ্ট
ফুটপাতের ঐ অনাথ শিশু হচ্ছে পথভ্রষ্ট।
ব্যবসাপাতি আজ উঠে যাচ্ছে লাটে
জীর্ণশীর্ণ ক্ষুধিতরা হাঁকছে রাস্তাঘাটে।

যানবাহনে শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ জীবন
দিনমজুর হকারদের আজ হচ্ছে যেন মরণ।
চা-শরবত আর পান বিক্রেতার দুঃখের অন্ত নাই
রাস্তার পাশে ঝালমুড়ি চাচার দেখা নাহি পাই।

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

আসসালামু আলাইকুম

সুপ্রিয় বন্ধুরা! কেমন আছো সবাই। আশা করি খুব ভালো আছো। স্কুলে যাচ্ছো নিয়মিত। দেখা হচ্ছে স্কুলের বন্ধুদের সাথে, হাসি আনন্দ আর হৈ-হুল্লোড়ে কাটছে তোমাদের সময়। ধীরে ধীরে আতঙ্ক কমে আসতে শুরু করেছে সবার মাঝে। তারপরও সতর্কতার বিকল্প নেই। যার যেভাবে ক্লাস চলছে তা চালিয়ে যাও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে। এদিকে ধীরে ধীরে কিন্তু ২০২১ সালের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা। আমাদের জীবন থেকে দুটি বছর কিন্তু এমনি এমনিই চলে গেছে। সে হিসেবে এ বছরের বাকী দিনগুলো খুব গুরুত্বসহকারে কাজে লাগাতে হবে তোমাদের। পুরো বছরের পড়ালেখার ঘাটতিটাও পূরণ করতে হবে।

বন্ধুরা! রবীউস সানী মাসের ১১ তারিখ বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর ওফাত দিবস, যা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে ফাতিহা-ই ইয়াজদাহম নামে সুপ্রসিদ্ধ। আব্দুল কাদির জিলানী (র.) ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের এক মহান মনিষী। মায়ের আনুগত্যতা আর সততার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন তা আজও পৃথিবীতে বিরল। ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান অনস্বী-কার্য। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে তার রূহানী ফায়য দান করেন।

ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ড. আল্লামা ইকবাল (র.)। যিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ। ছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় কবি। প্রথিতযশা এ মহাকবি ৯ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার কবিতার শ্লোকগুলো আজও পুরো বিশ্বকে জাগানিয়া ঝংকারে অনুরণিত করে। আল্লাহ তাআলা যেন এ মহান কবিকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন। মহাকবি আল্লামা ইকবালের একটি সুন্দর শ্লোক দিয়েই শেষ করছি আজকের চিঠি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এই প্রত্যাশা করছি। আল্লামা ইকবাল বলেন, 'চলো আমরা মোমবাতির মতো বাঁচি, নিজেকে বিসর্জন দিয়ে অন্যকে আলোকিত করি।'

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই!

আশাকরি ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি। পরওয়ানা অক্টোবর সংখ্যা হাতে পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি। ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংখ্যা হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে এ সংখ্যাটি। অনেক কিছুই জানার সুযোগ হয়েছে এ মাসের পরওয়ানা থেকে। শ্রদ্ধাভাজন সম্পাদকসহ পরওয়ানা পরিবারকে মুবারকবাদ সময়োপযোগী বিভিন্ন লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ একটি সংখ্যা উপহার দেওয়ার জন্য। আমাদের প্রত্যাশা, পরওয়ানা এভাবেই পাঠকপ্রিয়তার প্রতিফলন ঘটাবে সবসময়।

মাহফুজ আহমদ
শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ
মিরাবাজার, সিলেট

- আন্দালিব ভাই: অক্টোবর সংখ্যা ছিল ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংখ্যা। সে হিসেবে এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের বিভিন্ন দিক। তোমার মতো অনেকেই এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলো পছন্দ করেছেন। পরওয়ানায় আর কী চাও তা অবশ্যই তোমরা লিখে পাঠাতে পারো। তোমাদের দাবির প্রেক্ষিতে পরওয়ানা সাজবে সুন্দর বিন্যাসে। পরওয়ানা যেনো হয় তোমাদের সকলের জ্ঞানের জ্বলন্ত প্রদীপ।

আলহামদুলিল্লাহ। বছরের শুরু থেকেই পরওয়ানা বেশ চমক দেখিয়ে আসছে যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের নেতৃত্বে। সময়োপযোগী লিখনীর মাধ্যমে দ্বীনের সহীহ আক্বীদা প্রচার করছে প্রতিনিয়ত। মাদরাসা শিক্ষিত,সাধারণ শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত সবার জন্যই সমানভাবে উপকারী এ ম্যাগাজিনটি।

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্মৃতিবিজড়িত পরওয়ানা আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে চলেছে। আমরাও এর অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পেরে গর্বিত।

হাবিবুর রহমান
ধনপুর, সদর, সিলেট

- আন্দালিব ভাই: তোমার চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পরওয়ানার একজন শুভাকাংখী সুহৃদ হিসেবে তোমাকে সুস্বাগতম।পরওয়ানা বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাসে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে।পরওয়ানায় তোমাদের নিয়মিত অংশগ্রহণ পরওয়ানাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তোমরা লিখে যাও নিয়মিত।তোমাদের সকলের জন্য শুভকামনা সবসময়।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! আশাকরি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আপনাদের দুআয় । বরাবরের মতো অক্টোবর সংখ্যাও ভীষণ ভালো লেগেছে। বিশেষ করে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক লেখাগুলো খুব গুরুত্বপুর্ণ ছিল, এটা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। আমি পরওয়ানার আবাবীল ফৌজের প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করি। নিয়মিত লেখাও পাঠাই। এটা আমার জন্য একটি আনন্দের বিষয়। তাছাড়া জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগেও আমি নিয়মিত প্রশ্ন পাঠাই। অনেক আগে আমি কিছু প্রশ্ন পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। এতে

আমি চিন্তিত যে আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে পৌঁছেছে কি না। এখন আমার করণীয় কী হতে পারে যদি বলতেন।

বদরুল ইসলাম
নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। অক্টোবর সংখ্যা তোমার ভালো লেগেছে শুনে আমরা প্রীত হলাম। আবাবীল ফৌজের নিয়মিত প্রতিযোগী হিসেবে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমার লেখা আমরা নিয়মিত পাই। আশাকরি তোমার এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে তুমি প্রশ্ন পাঠিয়েছো কিন্তু উত্তর পাওনি। পরওয়ানায় জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে অসংখ্য প্রশ্ন জমা আছে যা ধারাবাহিকভাবে উত্তর দেওয়া হচ্ছে। সে হিসেবে তোমার প্রশ্নের উত্তরও সেই ধারাবাহিকতায় চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। এতে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তোমার জন্য রইলো শুভকামনা।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! আমি মাসিক পরওয়ানার নিয়মিত পাঠক। আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো আমার খুব ভালো লাগে। আমারও ইচ্ছে করে আবাবীল ফৌজে লিখতে। আমি আবাবীল ফৌজ এর সদস্য হতে আগ্রহী। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবো।

মো. মাহবুব আলম
সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: মাসিক পরওয়ানার নিয়মিত পাঠক হিসেবে তোমাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো তোমার ভালো লাগে শুনে আমরাও খুশি হলাম। তুমি অবশ্যই আবাবীল ফৌজে লিখতে পারো। লেখা পাঠানোর নিয়মও খুবই সহজ। আমাদের কাছে লেখা পাঠাতে তুমি পোস্ট মারফতে পাঠাতে পারো। অথবা আবাবীলের নির্ধারিত ই মেইলে পাঠিয়ে দিতে পারো তোমার যেকোন লেখা। তোমাকে আবাবীল ফৌজের সদস্য করে নেওয়া হলো। এবার খুশিতো? আবাবীলের পরিবারভুক্ত হতে পেরে কেমন লাগছে তা কিন্তু লিখতে ভুলবেনা কেমন। আজ তাহলে এ পর্যন্তই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এই কামনা করছি।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. ইরানের প্রেসিডেন্টের নাম কী?
২. রাখাইনের আদি নাম কী ছিল?
৩. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় কবে?
৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) জন্মগ্রহণ করেন কবে?
৫. 'ফুতুহুল গাইব' কার লেখা?

গত সংখ্যার উত্তর

১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
২. আবিসিনিয়ার 'নেগাস' (রাজা) আশামা
৩. ইমাম বাইহাকী
৪. রিসেপ তায়্যেব এরদোয়ান
৫. ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

হাফসা আল বাছিত, লুৎফুর রহমান স্কুল এন্ড কলেজ উচ্চ বিদ্যালয়, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # মারজান আল লতিফ, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # শরিফ আহমদ, সৎপুর কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # মাহবুবা রহমান সিদ্দীকা, পূর্ব রেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # সুলতান আল বাছিত, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # বদরুল ইসলাম, নোয়াগাঁও, দনারাম, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মো. তামবীর হাসান রুহান, জায়ফরনগর উচ্চ বিদ্যালয়, জুড়ী-৩২৫১, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # হাফিজ মিজানুর রহমান, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # তাহিয়াত মাহবুবা, শাহজালাল দারুসসুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাহমুদুল হাসান মারুফ, দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # হুমায়রা হোসেন সুমাইয়া, জাহান আরা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষিপাশা, চরমহল্লা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মাহিনুল হক আব্দুল্লাহ, জামিয়া হুসাইনিয়া আসআদুল উলূম নূরানী কিন্ডারগার্টেন ও হাফিযিয়া মাদরাসা, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # ইসমাঈল হোসেন তামীম, বাইতুন নূর মাদরাসা, মেরাদিয়া, রামপুরা, ঢাকা # সামিয়া আক্তার, জালালাবাদ কলেজ, সিলেট # আইমান হোসেন জিসান, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এণ্ড কলেজ, মিরাবাজার, সিলেট।

শব্দকল্প

১		২	■	৩	৪
	■	৫			
■	■		■		■
■	৬	■	৭		৮
৯				■	
■		■	১০		

সূত্র : পাশাপাশি

১। নবীর শহর ৩। মুসলমানদের কিবলাহ ৫। ইসলামী শিক্ষালয় ৭। শরীরের ঢেকে রাখা অংশ ৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০। উপাধি, খেতাব

সূত্র : উপর-নীচ

১। কুরআনে বর্ণিত নিরাপদ নগরী ২। ইসলামের পঞ্চস্তম্বের অন্যতম ৩। আউলিয়ায়ে কিরামের অলৌকিকতা ৪। নীড়, বাড়ি ৬। সাদা সুগন্ধযুক্ত ফুল ৭। প্রভাত, প্রাত:কাল ৮। হিজরী সনের একটি মাস

গত সংখ্যার সমাধান

ঈ	গ	ল	■	ম	দী	না
দে	■	■	গ্রা	ম	■	■
মী	কা	ত	■	তা	■	হি
লা	শ	■	ক্ষ	■	অ	জ
দু	■	প	য়	গা	ম্ব	র
ন্ন	■	রা	■	■	র	ত
বী	জ	গ	ণি	ত	■	■

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী

মাহিনুল হক আব্দুল্লাহ

জামিয়া হুসাইনিয়া আসআদুল উলুম নূরানী কিন্ডারগার্টেন
শাহজালাল উপশহর, সিলেট

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

মুহাম্মদ কাওছার মাহমুদ, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, পাঠানটুলা, সিলেট # শরিফ আহমদ, সৎপুর কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # মাহবুবা রহমান সিদ্দীকা, পূর্ব রেঙ্গাঁ উচ্চ বিদ্যালয়, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # মো. কামরুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, সিলেট # জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মো. মহরম আলী, চিতলিয়া, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # নাহিদা জান্নাত মাছুমা, তৈয়বুন্নেছা খানম সরকারি কলেজ, জুড়ী, মৌলভীবাজার # হুমায়রা হোসেন সুমাইয়া, জাহান আরা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষিপাশা, চরমহল্লা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # ইসমাঈল হোসেন তামীম, বাইতুন নূর মাদরাসা, মেরাদিয়া, রামপুরা, ঢাকা # সামিয়া আক্তার, জালালাবাদ কলেজ, সিলেট।

বর্ণকল্প

এ সংখ্যার বর্ণকল্প

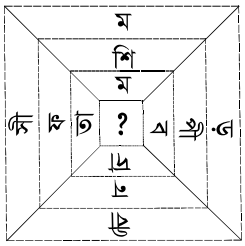

বর্ণগুলো এলোমেলা আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার সংখ্যাকল্পের সমাধান

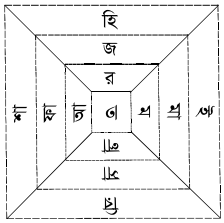

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী

মো. সুজন আহমদ

হাজী আসমত সরকারি কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

রুবিনা আক্তার ফাহমিদা, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # মুনাব্বিহ সাবিক, আলমদ্বীন, মনজলাল, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # সাহেরা আক্তার (মুক্তা), ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. ফাহিম উদ্দীন, তালিমপুর বাহারপুর ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বড়লেখা, মোলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, শাহজালাল দারুসসুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # সুলতান আল বাছিত, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # মাহমুদুল হাসান মারুফ, দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # মুহাম্মদ কাওছার মাহমুদ, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, পাঠানটুলা, সিলেট # মো. কামরুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # বদরুল ইসলাম, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # শরিফ আহমদ, সৎপুর কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # মোছা. রাবেয়া রহমান, চৌধুরী গাঁও, বিশ্বনাথ, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. সাজ্জাদুর রহমান সাগর, টেককামাল পুর, বিশ্বনাথ, সিলেট # সুমাইয়া জান্নাত সায়মা, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, মিরাবাজার, সিলেট # মাহবুবা রহমান সিদ্দীকা, পূর্ব রেঙ্গাঁ উচ্চ বিদ্যালয়, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # মোছা. ফারিয়া আক্তার জয়া, সরকারি জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ # নাহিদা জান্নাত মাসুমা, তৈয়বুন্নেছা খানব সরকারি কলেজ, জুড়ী, মৌলভীবাজার # রাশেদ আহমদ, সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, সিলেট # রোমান আহমেদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # হাফিজ মিজানুর রহমান, সভাপতি, ১১ নং গজনাইপুর ইউনিয়ন আল ইসলাহ, মাহবুবুর রহমান বুলবুল, মুন্সির গাঁও, লামাকাজী, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. মহরম আলী, চিতলিয়া, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # তাবাসসুম মাশিয়া টুম্পা, কামারকান্দি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # তাহিয়াত মাহবুবা, শাহজালাল দারুসসুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

অদ্ভুত পৃথিবী

কুয়েতের আকাশে রহস্যময় টাকার বৃষ্টি

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ। দুপুরের পর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল কুয়েত সিটিতে। বিকেল বেলার শান্ত সৌম্য এক পরিবেশ। কুয়েতের বার্জ জেসিম শপিং মল এর সামনের ব্যস্ত রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক। হঠাৎ মানুষকে অবাক করে দিয়ে আকাশ থেকে শুরু হল টাকার বৃষ্টি। হাজার হাজার টাকা উড়ে এসে পড়ছে গার্জ জেসিম শপিং মলের সামনের রাস্তায়। পথচারিরা শুরুতে অবাক হয়ে গেলেও, পরে হুশ ফিরতেই তারা ব্যস্ত হয়ে রাস্তা থেকে টাকা কুঁড়াতে শুরু করল। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থামিয়ে মানুষ নেমে পড়ল রাস্তায়। সবাই যত বেশি সম্ভব টাকা কুড়িয়ে নিতে শুরু করল। বেশ কয়েক মিনিট যাবত এভাবে টাকার বৃষ্টি হল রাস্তায়।এই দিন কয়েক মিনিটে প্রায় বিশ থেকে ত্রিশ লাখ আরব আমিরাতের দিরহাম ঝড়ে পড়ে রাস্তায়। ডলারের অংকে হিসেব করলে দাঁড়ায় প্রায় ৮ লক্ষ মার্কিন ডলার। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনা স্থলে অনেকক্ষণ যাবত এই টাকার বৃষ্টি হয়। কীভাবে এল এই টাকা, কোথা থেকে এল, কাদের টাকা এই গুলো- তার কিছুই বুঝতে পারেনি কেউ। সবাই ব্যস্ত ছিল টাকা কুড়ানোর কাজে। কুয়েত সিটির রাস্তায় এক অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল সেদিন!

এত টাকা কীভাবে উড়ে এল, টাকার উৎস কী – এর ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেনি। শুরুতে অনেকে ভেবেছিল কোন বহুতল বিশিষ্ট ব্যাংক এর খোলা জানালা দিয়ে উড়ে এসেছে এই টাকা। কিন্তু ঘটনার পর দেখা গেল কোন ব্যাংক এই টাকা দাবি করেনি। এমনকি কোন ধনী ব্যক্তিও এগিয়ে এসে এই টাকার দাবি করেননি। তাই এত টাকার উৎস কারো পক্ষেই নিরুপন করা সম্ভব হয়নি। তাই কুয়েতের ইতিহাসে এই ঘটনা এক হতবাক করা রহস্য হয়েই থাকবে সব সময়। অবশ্য কিছু মানুষ এই ঘটনার ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাদের ধারণা কোন এক দয়ালু ধনী ব্যক্তি মানুষকে দান করার উদ্দেশ্যে এই টাকা নিয়ে প্লেনে ওঠেন। তারপর সেই প্লেন থেকে টাকার ব্যাগ উপুর করে দিয়ে সমস্ত টাকা আকাশে উড়িয়ে দেন। সেই টাকা বাতাসে ভাসতে ভাসতে কুয়েত সিটির বার্জ জেসিম শপিং মল এর সামনের রাস্তায় এসে পড়েছে। অনেকেই আবার এই মত মেনে নিতে নারাজ। কেউ যদি এতো উপর থেকে বাতাসে টাকা ভাসিয়ে দেয়, তাহলে তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। সেই টাকা আপনার বা আমার এলাকায় না এসে শুধুমাত্র কুয়েত সিটিতেই কেন পড়ল? এ সত্যিই এক আজব রহস্য যার কোন ব্যাখ্যা আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি!

হাসতে জানি

চিনির বস্তায় লবণ লিখা

ক্রেতাঃ ভাই চিনি আছে?
বিক্রেতাঃ হুম আছে তো,কতটুকু চাই?
ক্রেতাঃ চাইতো,চিনি কিন্তু কোথায়?
বিক্রেতাঃ এইযে! এই বস্তায়।
ক্রেতাঃ কিন্তু বস্তার গায়ে তো লিখা লবণ।
বিক্রেতাঃ হ্যাঁ ভাই, ঠিক বলেছেন! পিঁপড়ার ভয়ে চিনির বস্তায় লবণ লিখে রাখছি, যেন পিঁপড়ে টের না পায়।

সংগ্রহে- **বদরুল ইসলাম**, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩১১৮। মাহবুবা রহমান সিদ্দীকা
পিতা: মাও. মো. শুয়াইবুর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: পূর্ব রেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: পূর্ব মদনগৌরী
ডাক : ইলাইগঞ্জ
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩১১৯। জাবের আহমদ
পিতা: নিজাম উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি
গ্রাম: বাল্লাহ
ডাক: ইছামতি
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩১২০। আবূ সুফিয়ান সাদি
পিতা: আছাব উদ্দীন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: চোঘরী
ডাক: গোলাপগঞ্জ
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩১২১। সাদিয়া জান্নাত উর্মি
পিতা: এইচ কিউ এম সেলিম আহমদ কাওছার
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া আইডিয়াল ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন
গ্রাম: ঘাটপার
ডাক: চরমহল্লাবাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩১২২। নাদিয়া জান্নাত প্রমি
পিতা: এইচ কিউ এম সেলিম আহমদ কাওছার
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া আইডিয়াল ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন
গ্রাম: ঘাটপার
ডাক: চরমহল্লাবাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩১২৩। সাইমুম তাজওয়ার তাহমিদ
পিতা: মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: জামেয়া বাইতুল কুরআন মাদরাসা
গ্রাম: ষোলঘর
ডাক: সুনামগঞ্জ
থানা: সুনামগঞ্জ
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩১২৪। হাফিজ রাকিব মাহমুদ
পিতা: মো. আবু তালেব
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মিয়ার বাজার আলিম মাদরাসা
গ্রাম: বাশখলা
ডাক: পেপার মিলস
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩১২৫। মো. তামিম আল আতহার
পিতা: মো. ফরিদ উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ফেঞ্চুগঞ্জ মোহাম্মদিয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: ইসলামপুর
ডাক: ফেঞ্চুগঞ্জ
থানা: ফেঞ্চুগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩১২৬। রফিক আহমদ সালমান
পিতা: মো. শফিকুন নুর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: এসপিপিএম মাদরাসা
গ্রাম: বাশখলা
ডাক: পেপার মিলস
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩১২৭। নুযহাত সিদ্দিকা তাবাসসুম
পিতা: মোহাম্মদ জাহির উদ্দিন
গ্রাম: সাতপাড়া
ডাক: সোনালী বাংলাবাজার
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩১২৮। মোঃ মাহবুব আলম
পিতা: আব্দুল মান্নান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা
গ্রাম: উজান মেহের পুর
ডাক: দরগাহ বাজার
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

[আবাবীল ফৌজের বন্ধুরা! তোমরা যে কেউ পরিকল্পনা করে ‘শব্দকল্প’, ‘বর্ণকল্প’, সংখ্যাকল্প অথবা শিক্ষামূলক ‘ছোটগল্প’ ও ‘ছড়া/কবিতা’ লিখে পাঠাতে পারো। অবশ্যই লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলবে। আর মনে রাখবে, প্রত্যেক লেখার কপি রেখে পাঠাতে হবে, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।]

নিয়মাবলি

- আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে হলে নির্ধারিত সদস্য কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- ইসলামী ভাবধারার যেকোনো উন্নত মানের শিশুতোষ রচনা এ বিভাগে ছাপা হয়। সর্বোপরি শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ, তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের জন্যই ‘আবাবীল ফৌজ’।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হতে হবে। লেখার সাথে লেখকের পূর্ণ ঠিকানা থাকা চাই।
- বলতো দেখি, শব্দকল্প ও বর্ণকল্পের জবাব ও সমাধান চলতি মাসের ১৬ তারিখের মধ্যেই পত্রিকা অফিসে পৌঁছাতে হবে।
- ‘বলতো দেখি’র সঠিক জবাবদাতাদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।
- আবাবীল ফৌজের যেকোনো সদস্যের তৈরি করে পাঠানো শব্দকল্প, বর্ণকল্প মনোনীত ও প্রকাশিত হলে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- বর্ণকল্পে অংশগ্রহণকারী সঠিক জবাবদাতাদের নাম- ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় যত্ন সহকারে ছাপানো হবে।
- A4 কাগজে স্পষ্ট করে হাতে লিখে অথবা কম্পোজ করে আবাবীল ফৌজের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আবাবীল ফৌজ ও লেখার শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে।
- ই-মেইলের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেখা স্বতন্ত্র ফাইল করে মেইলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রতিটি লেখার সাথে নিজের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, শ্রেণি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে পাঠাতে হবে।

চিঠিপত্র

নিত্যপণ্যের দাম ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখুন

বিভিন্ন অজুহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। দেশে একবার যে পণ্যের দাম বাড়লে সাধারণত তা আর কমে না। বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা কাজ করলেও কিছুতেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে আসছে না। দ্রব্যমূল্য দেখভাল করতে ‘কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’ (ক্যাব) নামে একটি সংস্থা রয়েছে। তাদের কার্যক্রম আরও গতিশীল করা প্রয়োজন। নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে না থাকলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। মজুতদার ও লোভী ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো অবস্থা হলেও খুচরা ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের কষ্ট দিন দিন বাড়তে থাকবে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সবচেয়ে বেশি কষ্টকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন অল্প বেতনের সৎ সরকারি-বেসরকারি কর্মকতা-কর্মচারী, নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী। যেসব চাকরিজীবী সৎভাবে জীবন কাটান, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। নিম্নবিত্ত ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছেন। দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তারা। সরকারি নজরদারীতে বাজার, শপিংমলসহ নিত্যপণ্য বিক্রির জায়গাগুলোতে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে। মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

জাকারিয়া আহমদ
সিকন্দরপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

সঠিক তথ্য না জেনে গুজব ছড়ানো বন্ধ করুন

কোন তথ্য নিয়ে গুজব ছড়ানো আমাদের দেশের নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। আর এর প্রধান মাধ্যম হলো সোস্যাল মিডিয়া। করোনা মহামারীতে লকডাউনের কারণে অনলাইন নির্ভরতা বেড়েছে ব্যাপকহারে। বেড়েছে তথ্য বিভ্রাট ও গুজবের ছড়াছড়ি। কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে তথ্য যাচাই করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে কিছু ভুঁইফোঁড় অনলাইন পোর্টাল গুজবে হাওয়া দিতে কাজ করছে। গুজব ঠেকাতে মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোকে আরও বলিষ্ঠ ও উচ্চকিত কণ্ঠে এগিয়ে আসতে হবে। গুজব প্রতিরোধে প্রশাসনের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকেও এগিয়ে আসতে পারে। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে গুজববিরোধী আলোচনা উত্তম পন্থা হিসেবে বিবেচিত।ফেসবুকের কারণে গুজব ছাড়ানো সহজ হচ্ছে। কিন্তু গুজব প্রতিরোধেও আবার ফেসবুকেরই বড় ভূমিকা আছে। এখানেই গুজবের বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে। যেটা গুজব সেটাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে আগে কিন্তু এই সুযোগ ছিলোনা৷ একসময় ছেলে ধরার গুজবও এই ফেসবুকের মাধ্যমেই ছড়ানো হয়েছিল।

পদ্মা সেতুতে শিশুর রক্ত আর মাথা লাগার ওই গুজব শুধু ফেসবুকেই সীমবাদ্ধ থাকেনি, মানুষের মুখে মুখেও ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেধরা সন্দেহে অনেককেই জীবন দিতে হয় গণপিটুনিতে৷ ঢাকায় এক মা ও তার সন্তানকে স্কুলে ভর্তির খোঁজ খবর নিতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হয়ে জীবন দেন। আর ডেঙ্গু প্রকোপের সময় নানা গুজবের মধ্যে হারপিক দিয়ে মশা মারার গুজবও ফেসবুকে ভাইরাল হয়৷ তবে ফেসবুকেই আবার সেই গুজবের বিরুদ্ধেও কথা হয়৷ গুজব রোধে প্রশাসনের নিরঙ্কুশ ততপরতা খুবই জরুরী

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
কমলগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার